ইউনিট-১

ভূগোল ও পরিবেশ (Geography and Environment)

ভূগোল ও পরিবেশ ইউনিটটির ১ম পাঠে পাঠ্য বিষয় হিসাবে ভূগোল এর সম্পর্কে ধারণা পাব। এছাড়া ভূগোলের সংজ্ঞা, ভূগোল জ্ঞানের শুরুর ইতিহাস, আধুনিক ভূগোলের ধারণা সম্পর্কে জানব।

ভূগোল ধারণার ক্রমবিকাশ একদিনে হয়নি, ২য় পাঠে ভূগোলের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি সময় ভিত্তিক ধারণা পাব।

ভূগোলের পরিধি যা কিনা দুটি মূলধারায় বিভক্ত, প্রাকৃতিক ও মানবিক ভূগোল, এদের সম্পর্কেও ধারণা পাব ৩য় পাঠে। ৪র্থ পাঠে পরিবেশের অর্থ, প্রকৃতি ও উপাদানসমূহ সম্পর্কে জানব।

৫ম পাঠে ভূগোল ও পরিবেশের মধ্যকার সম্পর্ক এবং ৬ষ্ঠ পাঠে সমাজে ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানব। গঠনগত দিক দিয়ে এই ইউনিটটি ভূগোল ও পরিবেশ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেবে।

পাঠ ১.১ - পাঠ্য বিষয় হিসাবে ভূগোল : সংজ্ঞা ও ধারণা (Geography as a Discipline: Definition and Concept)

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে–

- ভূগোল সম্পর্কে ধারণা;
- ভূগোল জ্ঞানের শুরু
- আধুনিক ভূগোলের ধারণা সম্পর্কে।

ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ, স্থান।

ভূগোল পৃথিবীর উপরিভাগের স্থান সম্পর্কে ধারণা দেয়। তবে ভূগোলবিদদের ছাড়াও এই বিষয়ে ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞানী, আবহাওয়াবিদ, জীববিদ্যা, সমুদ্রবিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানের আরোও বেশ কিছু শাখায়ও ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ এবং তলদেশের বিষয়াদি সম্পর্কে ধারণা দেয়। তবে, শুধুমাত্র ভূগোল বিষয়ই ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের বিভিন্ন বিষয়াদির একটি সমন্বিত স্থানভিত্তিক ধারণা দেয়।

অতীতে সংঘঠিত ঘটনাবলী এবং বর্তমানের ঘটনাসমূহ পৃথিবীর কোন না কোন স্থানের সাথে জড়িত। এই সব ঘটনা সম্পর্কে জানতে গিয়ে মানুষ যে এলাকায় ঘটনা ঘটেছে সে সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়। মানুষের স্থান সম্পর্কে জানার এই আগ্রহ থেকেই ভূগোলের ভিত্তি তৈরি হয়।

ভূগোল কাকে বলে?

ইরেটোসথেনীস, হার্টশোন, পিটার হেগেট, হুমবোল্ট।

গ্রীক পন্ডিত ইরেটোসথেনীস (Eratosthenes) প্রথম ভূগোল শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। গ্রীক শব্দ 'জিও' (Geo-) অর্থ ভূমন্ডল বা পৃথিবী এবং 'গ্রাফি' (graphy) অর্থ বর্ণনা, সার্বিক অর্থে মানুষের আবাস এই পৃথিবীর বর্ণনা। ভূগোল বিষয়ের এই মূল ধারণার আজ অবধি তেমন বড় ধরনের কোন পরিবর্তন হয় নাই। তবে এই প্রসঙ্গে ভূগোল এর দুটি আধুনিক সংজ্ঞা বিবেচনা করা যেতে পারে। হার্টশোনের মতে- 'Geography is concerned to provide accurate, orderly and rational descriptions and interpretations of the variable character of the earth's surface'–'ভূ-পৃষ্ঠের বৈচিত্রময় বৈশিষ্ট্যাবলীর সঠিক, শ্রেণীবদ্ধ এবং যুক্তিসঙ্গত বর্ণনা এবং বিশ্লেষণই ভূগোলের আলোচ্য বিষয়'।

আরেকজন বিখ্যাত বৃটিশ আধুনিক ভূগোলবিদ পিটার হেগেট (১৯৮১) এর মতে- 'Geography is the study of the earth's surface as the space within which the human population lives'। অর্থাৎ যে শাস্ত্র ভূ-পৃষ্ঠকে মানবগোষ্ঠির বসবাসের স্থান হিসাবে অধ্যয়ন করে তাহাই ভূগোল। লক্ষ্যণীয় যে ভূগোলের এ দুটি আধুনিক সংজ্ঞার মূল বক্তব্য গ্রীকদের দেওয়া সংজ্ঞার অনুরূপ।

কাল ও সমাজের পটভূমির আলোকে পরিবর্তিত হয়েছে।

তবে, ভূগোল বিষয়ের মূল দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাখ্যা দানের পদ্ধতিগত দিক কাল ও সমাজের পটভূমির আলোকে পরিবর্তিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সপ্তদশ শতক থেকে বর্তমান কালের নির্বাচিত কিছু সংজ্ঞা নীচে দেওয়া হলো।

Geography is that part of mixed mathematics, which explains the state of the earth and of its parts, depending on quantity, viz. its figure, place, magnitude and motion, with the celestial appearence. (- Varenius, 1622)

Geography is the study of the earth. It explains the varieties found in the various parts of the earth. - Kant, I. (late 18th century)

Geography is the science related to nature... in it are studied and described all things found on earth. - Humboldt, A. Von (early 19th century)

Geography is the department of science that deals with the globe in all its features, phnomena, and relations as an independent unit, and shows the connection of this unified whole with man and with mans creator. - Ritter, C. (early 19th century)

Geography`s goal is nothing less than an understanding of the vast, interacting system comprising all humanity and its natural environment on the surface of the earth. - Ackerman, E.A (1963)

Geography seeks to explain how the subsystems of the physical environment are organized on the earths surface and how man distributed himself over the earth in relation to physical features and the other man. -Ad hoc committee on Academy of Science, Washington D.C (1965)

Geography is concerned with the existing material system forming the geographyical sphere of the earth as an environment for the actual or potential development of human society, together with the material aspects of social development expressed in its regional complexes within the geographical environment. - Anlechin, V.A (1973)

Geography is the study of relationship between man and his environment through space and time. - Anonymous (unknown)(1990)

উপরের এই সব সংজ্ঞা পর্যালোচনা থেকে লক্ষণীয় যে, উনিশ শতকের হুমবোল্ট পর্যন্ত ভূগোলের আলোচ্য বিষয়ে পৃথিবীর প্রাকৃতিক উপাদানের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে; মানুষ ও সামাজিক সংগঠনসমূহ তেমন গুরুত্ব পায় নাই। তবে হুমবোল্ট-এর সমসাময়িককালের ভূগোলবিদ কার্ল রিটার, মানুষকে ভূগোলের আলোচ্য বিষয় হিসাবে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ভূগোলে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষের সুনিবিড় সম্পর্ক পরবর্তী প্রায় সব ভূগোলবিদই তুলে ধরেছেন।

ভূগোল-প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষের সুনিবিড় সম্পর্ক।

বিংশ শতাব্দীতে মানুষ প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে আসছে। মানুষের কর্মকান্ডে প্রাকৃতিক পরিবেশ আর নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় না থাকলেও এর প্রভাবকে বহনযোগ্য মাত্রায় রাখার জন্য সম্ভাবনাময় বিকল্প উদ্ভাবনের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে যাতে পরিবেশগত ভারসাম্যতা বজায় রাখা সম্ভব হয়। তাই, আধুনিক ভূগোলবিদগণ সময় ও স্থানের আলোকে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মানুষের কর্মকান্ডের সম্পকর্দকেই ভূগোলের মূখ্য বিষয় হিসাবে দেখতে চান (Elahi, 2000)।

সময় ও স্থান।

ভূগোল জ্ঞানের শুরু

ভূগোল জ্ঞানের শুরুর ইতিহাস শত শত বছরের পুরানো। ধারণা করা হয় মানব সভ্যতার আদিকাল থেকেই মানুষ যখন বুঝতে পেরেছে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় খাদ্য সম্পদ বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো, সেই থেকেই মানুষের নিকট স্থানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। গ্রীক যুগের পন্ডিতগণ পৃথিবী সম্পর্কিত তথ্যাবলী সংগ্রহ করেন। তাঁরা জ্ঞান চর্চার সুবিধার জন্য এ সব তথ্যাবলীকে দুটো প্রধান অংশে ভাগ করেন : ভূগোল (পৃথিবীর ভূ-ভাগ সম্পর্কিত জ্ঞান চর্চা) ও মহাজাগতিক বিদ্যা (আকাশ, তারকারাজি ও মহাজগত বিষয়ক জ্ঞান চর্চা)। ইরেটোসেথেনিস (ca. 273 - ca. 192 B.C)-এর

গ্রীক যুগ, ভূগোল ও মহাজাগতিক

মতে ভূগোল ছিল পৃথিবীর সঠিক বর্ণনা। তাঁর জীবদ্দশায় শিলা, মৃত্তিকা ও উদ্ভিদ সম্পর্কে বিপুল তথ্য সংগৃহীত হয়।

অক্ষাংশ ভিত্তিক জলবায়ু অঞ্চল।

গ্রীক দার্শনিকগণ পৃথিবীর স্থান বর্ণনার বাহিরেও স্থান সমূহের তারতম্য এবং এর কারণ অনুসন্ধান করেন। যেমন, পৃথিবীর জলবায়ু সম্পর্কে জানার জন্য তাঁরা এর অঞ্চলভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ করেন যা অনেকটা আধুনিক অক্ষাংশভিত্তিক জলবায়ু অঞ্চলের অনুরূপ। তবে, গ্রীকদের তৈরিকৃত মানচিত্র ভূগোল জ্ঞান চর্চায় সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে।

ভূগোল বিষয়ক জ্ঞানচর্চা মধ্য যুগে হ্রাস পায়, বিশেষত: ইউরোপে। বিশ্ব পরিভ্রমণ যুগে (১৫০০-১৯০০) নতুন নতুন দেশ আবিস্কারের ফলে ভৌগোলিক জ্ঞানের কদর বেড়ে যায়। এই সময়কার বিজ্ঞানীরা ভৌগোলিক তথ্যাবলীকে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক কাঠামোর আওতায় দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। এই কাজে, বিজ্ঞানী বার্হনহার্ডাস ভেরিনিয়াস (১৬২২-১৬৫০) সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন।

উার্হনহার্ডস ভেরিয়িাস ভূগোলকে (১) প্রাকৃতিক (২) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এই দুইভাগে ভাগ করুন।

তিনি ভৌগোলিক তথ্যাবলীকে দুটি অংশে ভাগ করেন। একটি, প্রাকৃতিক যার আওতায় বায়ুমন্ডলীয়, পানি এবং অশ্মমন্ডলীয় বিষয়ক তথ্যাবলী অন্তর্ভূক্ত। অপরটি, পৃথিবীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিন্যাস/ধরন সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিবেচনা করা হয়। তবে, ভূগোল বিষয় চর্চার এই পর্যায়ে ভেরিনিয়াস স্পষ্টতই মানুষের সাথে বাহ্যিক পৃথিবীর আন্ত:সম্পর্কের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

ইমানুয়েল কান্ট-জ্ঞানকে তিনভাবে সংগঠিত করা যায়।

ভেরিনিয়াস ভূগোল বিষয়কে একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক কাঠামো দিয়ে থাকলেও এইক্ষেত্রে ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) ভূগোলকে বিজ্ঞানে স্থান করে নিতে বিশেষভাবে অবদান রেখেছেন। কান্টের মতে, জ্ঞানকে তিনভাবে সংগঠিত করা যায়। **এক)** জ্ঞান চর্চার প্রাপ্তফলকে বিষয় গতি তারতম্যের ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাজনের মাধ্যমে। এর ফলস্বরূপ যেমন, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ইত্যাদি যা নিয়মাবদ্ধ ক্ষেত্র (Systematic fields) নামে পরিচিত। **দুই)** ঐতিহাসিক পদ্ধতি অবলম্বনে অর্থাৎ সময়ের আলোকে সম্পর্ক বিবেচনা করা। **তিন)** কিভাবে স্থানসমূহ পরস্পরে সম্পর্কিত তা জানার মাধ্যমে। মূলত: এই বিষয়টিই ভূগোল চর্চার ক্ষেত্র।

ভূগোলের প্রাচীন ধারণাসমূহ উল্লেখ করুন।

আধুনিক ভূগোলের ধারণা

আধুনিক ভূগোল পৃথিবী পৃষ্ঠের বিষয় কোথায়, কোন ও এর ফলাফল।

কান্টের দেওয়া দার্শনিক কাঠামোর মাধ্যমে ভূগোল অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিজের একটি দৃঢ় অবস্থান করে নিতে পেরেছে। পরবর্তীতে ভূগোল চর্চার প্রধান লক্ষ্য দাঁড়ায় বিভিন্ন বিষয়সমূহের স্থানিক বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও ধরনের ব্যাখ্যা প্রদান করা এবং তাদের তুলনা ও তারতম্য তুলে ধরা।

ভূগোল চর্চায় তিনটি প্রধান প্রধান বিষয় গুরুত্ব পায়:

- পৃথিবী পৃষ্ঠের বিষয়সমূহ (Features) কোথায় (Where) অবস্থিত?
- এই সব বিষয়সমূহ কেন সেখানে অবস্থিত? এবং
- এই সব বিষয়সমূহের এই অবস্থানের ফলাফল কি?

প্রথম প্রশ্নটি ভূগোলের মূল উপপাদ্য বিষয় হলেও 'কোথায়' এর মাধ্যমে মূলতঃ কোন বস্তুর অবস্থানগত ব্যাখ্যাই নির্দেশ করে। কোন বস্তু শুধুমাত্র কোথায় অবস্থিত জানলে ভূগোল চর্চা খুবই সংকীর্ণ হতো। তাই, কোন বস্তু যেখানে আছে কেন সেখানে অবস্থিত, কিভাবে সেস্থানে এর উদ্ভব/বিকাশ ঘটে, ভূগোল এই সব বিষয়ের বন্টনগত তারতম্য ও বিন্যাসের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দানে চেষ্টা করে থাকে।

ভূগোল চর্চা থেকে লব্ধ জ্ঞানকে ৬টি প্রধান ধারণায় ভাগ করা যেতে পারে। এগুলো হলোঃ

ক. বিশ্বময়তা (Globalism)
ঘ. আন্তঃসংযোগময়তা (Inter relatedness)
খ. বৈচিত্রতা/বিধিময়তা (Diversity-Variability)
ঙ. পরিবর্তন (Change)
গ. স্থানিক অবস্থান (Spatial Location)
চ. সংস্কৃতি (Culture)

ভূগোল চর্চা লব্দ জ্ঞান ৬টি প্রধান ধারনায় বিভক্ত।

ক. বিশ্বময়তাঃ পৃথিবীকে একটি ভূগোলক হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং এর সাথে সৌরজগতের বিশেষ সম্পর্ক আছে। তাছাড়া, ভূগোলককে বিভিন্ন অক্ষ ও দ্রাঘিমা রেখা দ্বারা ভাগ করা হয়, যা পৃথিবীর স্থানগত পরিমাপ, আবহাওয়া ও জলবায়ুগত তারতম্য জানতে সহায়ক হয়। মোট কথা, পৃথিবী, সূর্য সম্পর্কিত জ্ঞান, গ্রীড, স্কেল, এই সবই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

খ. বৈচিত্রতাঃ পৃথিবী পৃষ্ঠের বিভিন্ন বস্তু অসমানভাবে বন্টিত, ফলে পৃথিবী বৈচিত্রময় অর্থাৎ স্থান সমূহে পার্থক্য দেখা যায়। এই বিবিধময়তা প্রকাশে ভূগোলে তিনটি ধারণা ব্যবহার করা হয়। যথাঃ বিন্যাস, স্থানিক তারতম্য ও আঞ্চলিকরণ।

গ. স্থানিক অবস্থানঃ স্থানিক অবস্থানকে ও তিনটি উপ-ধারণায় প্রকাশ করা হয়। যথাঃ অবস্থানগত (Position)−(যা পৃথিবী পৃষ্ঠে কোন বস্তুর সুনির্দিষ্ট অক্ষ ও দ্রাঘিমা রেখাভিত্তিক অবস্থান নির্দেশ করে), স্থানগত (যা সে স্থানের প্রকৃতি বুঝায়) ও পরিস্থিতিগত (যা পার্শ্ববর্তী বস্তুর আলোকে এর অবস্থানগত গুরুত্ব ইঙ্গিত করে)।

ঘ. আন্তঃসংযোগময়তাঃ ভূ-বৈচিত্রময়তা সত্ত্বেও ভূগোলবিদগণ মনে করেন, পৃথিবীর স্থানসমূহের সাথে এবং বিষয়সমূহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ভূগোলের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্থান ও বিষয়সমূহের এ পারস্পারিক সম্পর্ককে বিভিন্ন নামে ভূগোলে অভিহিত করা হয়। যেমন- আন্তঃ নির্ভরশীলতা, আন্তঃ সংযোগ, স্থানিক মিথষ্ক্রিয়া এবং স্থানিক সহ-সংশ্রব।

ঙ. পরিবর্তনঃ ভূ-পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্যাবলী সদা পরিবর্তনশীল। মানুষ, প্রকৃতি ভূ-পৃষ্ঠের এ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ট হিসাবে কাজ করে। যেমন, মানুষ বনভূমি উজাড় করে, ফলে ভূমিক্ষয় বেড়ে যায় এবং নদীতে বাড়তি পলি জমে নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে। নদীর পথ পরিবর্তন কিংবা নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় নৌপরিবহন ব্যবস্থা ও কৃষিকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। আবার প্রকৃতি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভূমিকম্প বা আগ্নেয় তৎপরতার মাধ্যমে কোন স্থানের ভূ-পৃষ্ঠে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে পারে। ভূ-পৃষ্ঠের এ পরিবর্তন সাধনে যে সব প্রক্রিয়াসমূহ কার্যরত আছে সেগুলোকে তিন ভাগে দেখানো হয়। যথাঃ

- *প্রাকৃতিক*
- *জৈব*
- *সামাজিক*
- *প্রক্রিয়া সমূহ।*

- প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াসমূহ (Physical Processes)
- জৈব প্রক্রিয়াসমূহ (Biotic Processes)
- সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহ (Social Processes)

চ. সাংস্কৃতিক অঞ্চলসমূহ : আধুনিক ভূগোলের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো মানুষ বিভিন্ন পরিবেশে কিভাবে নিজেকে মানিয়ে নেয় এবং প্রাকৃতিক প্রতিকূল অবস্থাকে কতখানি জয় করে

নিজের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে পারে তা জানা। মানুষের সংস্কৃতির মান/পর্যায় দ্বারাই নির্ধারিত হয় সে কতখানি প্রকৃতিকে কাজে লাগাতে পারবে। সাংস্কৃতিক অঞ্চল বিষয় ভৌগোলিক জ্ঞান চর্চা মানুষ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সম্পর্ক ছাড়াও এর আহরণ ও সহনশীলতা এবং মানবতা সম্পর্কে ধারণা পেতে সাহায্য করে।

পাঠ সংক্ষেপ

ভূগোল বিষয়ের প্রধান লক্ষ্য মানুষের আবাসভূমি হিসাবে পৃথিবীকে জানা। গ্রীক যুগ থেকে ভূগোল ধারণার গোঁড়াপত্তন হয়। সে সময় ভূগোল পৃথিবীর ভূভাগ ও মহাজাগতিক বিদ্যাচর্চায় সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রীকদের তৈরিকৃত মানচিত্র ভূগোল চর্চায় বিশেষ অবদান রেখেছে। ইউরোপীয় বিশ্ব পরিভ্রমণ যুগে ভূগোল বিষয়ের কদর বাড়তে থাকে। এ সময়ের বিজ্ঞানী ইমানুয়েল কান্ট ভূগোলকে বিজ্ঞানে স্থান করে নিতে বিশেষ অবদান রেখেছেন। আধুনিক যুগের ভূগোল চর্চায় বিভিন্ন বিষয়ের স্থানিক বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও অবস্থানগত ধরনের ব্যাখ্যা প্রদান করা এবং পরস্পরের তুলনা ও তারতম্য অনুসন্ধান করার দিকেই সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১। **সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন** (সময়- ৩ মিনিট) ঃ

১.১ গ্রীক পন্ডিতের সংগৃহীত তথ্যাবলীকে প্রধান কয়টি ভাগে ভাগ করেন?

ক. ২টি খ. ৩টি গ. ৪টি

১.২ ভূগোল শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন-

ক. ইরেটোসথেনীস খ. ইমানুয়েল কান্ট গ. স্ট্রাবো

১.৩ কান্টের মতে জ্ঞানকে সংগঠিত করা যায়-

ক. ২ ভাবে খ. ৩ ভাবে গ. ৪ ভাবে

২। **শূণ্যস্থান পূরণ করুন** (সময়- ৩ মিনিট) ঃ

২.১. ইরেটোসথেনীস শিলা, মৃত্তিকা ও ... ... সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন।

২.২. ভেরেনিয়াস ভৌগোলিক তথ্যাবলীকে দুটি পৃথক ভাগে ভাগ করেন। একটি প্রাকৃতিক ভূগোল; অপরটি ... ...।

২.৩. ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন সাধনে যে সব প্রক্রিয়াসমূহ কার্যরত আছে সেগুলো হলো... ... ..., জৈব ও সামাজিক।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী (সময় ৩ * ২ = ৬ মিনিট)

১. ভূগোলের প্রকৃতি কি?

২. ভূগোল দর্শনে ইমানুয়েল কান্টের অবদান কি?

৩. ভূগোল চর্চায় কোন কোন বিষয় গুরুত্ব পায়?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. ভূগোল সম্পর্কে ধারণা দিন এবং ভূগোল জ্ঞানের শুরু কিভাবে হয়েছিল বর্ণনা করুন।

২. আধুনিক ভূগোল সম্পর্কে ধারণা দিন।

পাঠ ১.২ - ভূগোল ধারণার ক্রমবিকাশ (Development of Geographic Knowledge)

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে–

◈ ভূগোল ধারণার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে।

ভূগোল ধারণার উদ্ভব ও বিকাশ যেমন সর্বত্র সমান নয় তেমনি সময়ভেদেও এর বিকাশে ব্যাপক তারতম্য ঘটেছে। ভূগোল এর বিকাশকে কালক্রম, বিষয়ভিত্তিক এবং পর্যায়ভিত্তিক এই তিনভাবে প্রকাশ করা যায়। তবে, কালক্রম অনুসারে বিবরণই তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক। কারণ, তাতে সময় বিচারে ভূগোলের চিন্তার অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব। নিম্নে কালক্রম অনুসারে ভূগোলের বিকাশ আদি, মধ্য ও আধুনিক যুগ এই তিন পর্বে তুলে ধরা হলো।

কালক্রম, বিষয়ভিত্তিক এবং পর্যায়ভিত্তিক

আদিযুগ: ভূগোলের যাত্রা শুরু গ্রীক দার্শনিকদের জ্ঞানচর্চা থেকে। তাই শুরুতেই ভূগোল ধারণার অগ্রগতিতে গ্রীক ও রোমানদের এসব অবদান সারণি-১.২.১ সংক্ষেপে দেওয়া হলো:

ভূগোল এর বিকাশকে কালক্রম অনুসারে বর্ণনা করা তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক।

সার্বিকভাবে বলা যায়, গ্রীক যুগে ভূগোল বিষয়ক ধারণার যে উন্মেষ ঘটে তা প্রধানত প্রাকৃতিক ও গাণিতিক ভূগোলকে সমৃদ্ধ করে। গ্রীকদের প্রস্তাবিত পৃথিবীর তিনটি জলবায়ু অঞ্চলের ধারণা-উষ্ণ, নাতিশীতোষ্ণ ও শীতল অতিমাত্রায় সরলীকৃত হলেও আকর জ্ঞান হিসাবে বর্তমানেও এর গ্রহনযোগ্যতা আছে।

গ্রীক যুগে প্রাকৃতিক ও গাণিতিক ভূগোল জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়।

গ্রীকদের দেওয়া জলবায়ু অঞ্চলের প্রধান ভাগগুলো কি কি।

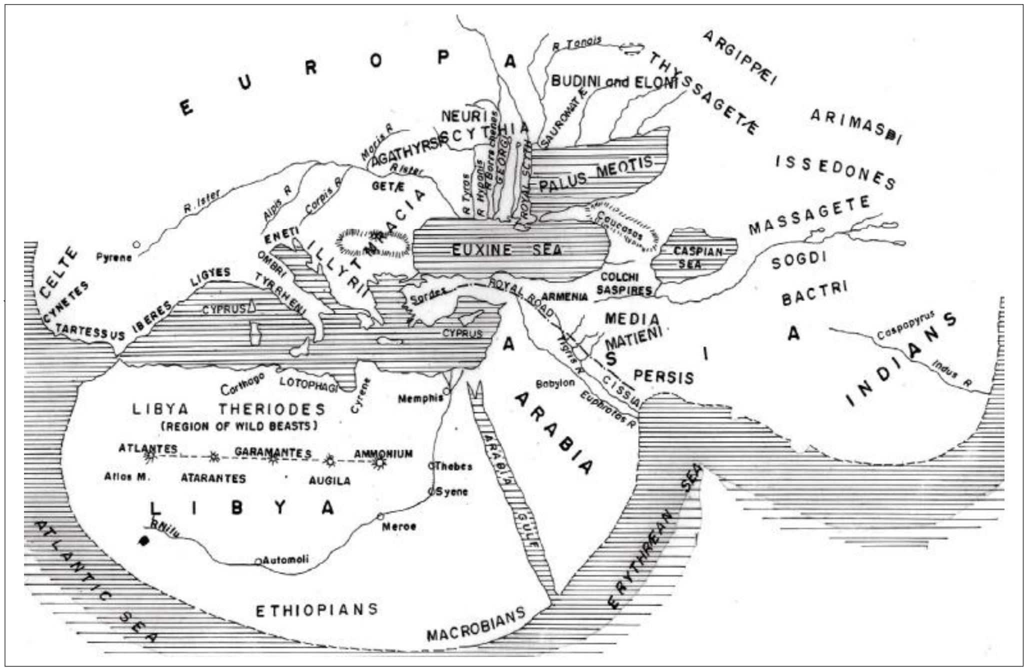

সারণি ১.২.১: গ্রীক ও রোমান ভূগোলবিদদের ভৌগোলিক অবদান

আদিযুগ।

গ্রীকযুগ

সময়কাল	ভূগোলবিদ	ভৌগোলিক ধারণা
খ্রিস্টপূর্ব ৬০০-১৪০ সাল	থেলেস	১. জ্যামিতিক চর্চার মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত বিষয়সমূহের পরিমাপ ও অবস্থান জানতে সক্ষম হন। ২. পৃথিবীকে পানিতে ভাসমান চাকতি আকৃতির বস্তু হিসাবে প্রথম ধারণা দেন।
	অ্যানাক্সিম্যান্ডার	১. খাড়া কাঠের দন্ডের সাহায্যে সূর্য-গ্রহ-তারা প্রভৃতির আপেক্ষিক অবস্থান পরিমাপের উদ্যোগ নেন।
	হেক্যাটিয়াস	১. ভূমধ্যসাগর, দ্বীপসমূহ, প্রণালী ও দূরবর্তী স্থান সম্পর্কে বর্ণনা দেন। তাঁর মতে, পৃথিবীর আকার চ্যাপ্টা ও গোলাকার এবং গ্রীস এর কেন্দ্রে অবস্থিত।
(৫০০)	হেরোডোটাস	১. কৃষ্ণসাগর, রাশিয়ার স্তেপ তৃনভূমি ও পারস্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বর্ণনা দেন। ২. প্রথম দ্রাঘিমা অংকন করেন। ৩. নীল নদ সৃষ্ট বদ্বীপ সম্পর্কে ধারণা দেন। ৪. পৃথিবীর মানচিত্র অংকন করেন (চিত্র-১.২.১)
(৩৮৪-৩২২)	অ্যারিস্টটল	১. অক্ষাংশগত তারতম্য ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশের মানুষের ব্যবহার নিয়ন্ত্রন করে।
	হিপোক্রেটাস	১. প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে কোনও অঞ্চলের মানুষের জাতীয় বৈশিষ্ট্যাবলীর নিবীড় সম্পর্ক আছে।
(২৭৬)	ইরেটোসথেনিস	১. পৃথিবীর আকৃতি গোলাকার নয় বলে তিনি দাবী করেন। তিনিই প্রথম সঠিকভাবে পৃথিবীর আয়তন পরিমাপ করেন। ২. পৃথিবী থেকে সূর্য চন্দ্রের দূরত্ব পরিমাপের চেষ্টা করেন। ৩. অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা দ্বারা সঠিকভাবে কোন স্থানের অবস্থান নির্ণয় করেন। ৪. পৃথিবীর মানচিত্র অংকন করেন (চিত্র-১.২.২)
(১৪০)	হিপারকাস	১. প্রথম অক্ষরেখার ভিত্তিতে পৃথিবীকে কয়েকটি জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করেন। ২. সমতল কাগজে গোলাকার পৃথিবীকে অংকন করার কৌশল আবিষ্কার করেন।

রোমান যুগ

সময়কাল	ভূগোলবিদ	ভৌগোলিক ধারণা
খ্রিস্টপূর্ব ৬৪ সাল	স্ট্রা বো	প্রধান গ্রন্থ ‘জিওগ্রাফিয়া'। ১. ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ভূগোল সম্পর্কিত ধারণা দেন। ২. ভূগোল ও ইতিহাসের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা তুলে ধরেন। ৩. পৃথিবীর মানচিত্র তৈরী করেন (চিত্র-১.২.৩)
১৩৬ খ্রিস্টাব্দে	ক্লডিয়াস টলেমি	প্রধান গ্রন্থ - অ্যালমাগাষ্ট' ও ‘দি আউট লাইন অব জিওগ্রাফী'। ১. মানচিত্র প্রস্তুতকরণ। ২. পৃথিবীকে ৩৬০টি অংশে ভাগ করে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা ব্যবহারের মাধ্যমে যে কোন স্থানের সঠিক অবস্থান নির্নয়ের পদ্ধতি প্রচলন করেন। ৩. টলেমির প্রস্তুতকৃত মানচিত্রে প্রথম বঙ্গোপসাগর, গঙ্গা নদী ও তার উৎস

		হিমালয় পর্বত দেখানো হয় (চিত্র-১.২.৪)। ৪. আরব উপদ্বীপ ও নীল নদের উৎস সম্পর্ক বর্ণনা দেন।

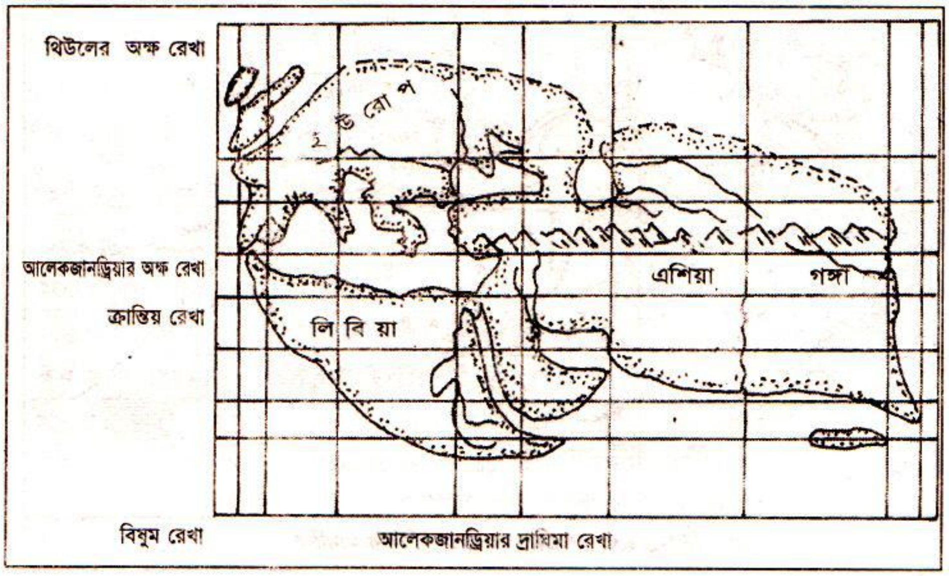

চিত্র-১.২.২ : ইরেটোসথেনিস এর অংকিত পৃথিবীর মানচিত্র।

ভূগোলে টলেমীর প্রধান অবদান কি কি?

গ্রীক ও রোমান ভূগোলবিদদের অবদান সার্বিকভাবে ৪টি শাখায় ভাগ করা যায়। যথা:

ক) ভূগোল মূলতঃ অবস্থান ও বিভিন্ন স্থানের পারস্পরিক সংযোগ ও নির্ভরশীলতা বিষয়ক বর্ণনায় সীমাবদ্ধ।

খ) কোরোগ্রাফি, প্রকৃতির বিভিন্ন বৈচিত্রময় অংশের মধ্যে মিল বা যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা।

গ) টোপোগ্রাফি, একটি পৃথক বিষয় বা এক ধরনের অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা।

ঘ) কসমোগ্রাফি, পৃথিবীর আকার, আয়তন ও এর বিভিন্ন অংশবিশেষের বর্ণনা।

গ্রীক ও রোমানদের সমসাময়িককালে চীন দেশেও ভূগোল জ্ঞানের বিকাশ ঘটে; বিশেষত ভূগোলে তত্ত্বজ্ঞান ও সূক্ষ্ম পরিমাপ, শূন্যের ব্যবহার এবং দশমিক পদ্ধতি প্রচলন উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া, চীনের স্থানভিত্তিক মৃত্তিকা, কৃষি উৎপাদন ও পানি পথের পরিবহন সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা, পানি চক্রের ধারণা, অবাঞ্চিত বনভূমি ধ্বংসের কুফল সম্পর্কে আগাম সতর্কতা সেই সময়কার ভূগোল ধারণার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ইঙ্গিত করে। এই সময়ে চীনের কাগজ আবিষ্কার, বই ছাপানোর পদ্ধতি, বৃষ্টিমাপার যন্ত্র এবং সমুদ্রে ব্যবহার উপযোগী চুম্বকীয় কম্পাস উদ্ভাবন, ভূগোল জ্ঞানের সম্প্রসারণে বিশেষভাবে অবদান রাখে।

গ্রীক ও রোমানদের সমসাময়িক কালে চীন দেশেও ভূগোল জ্ঞানের বিকাশ ঘটে।

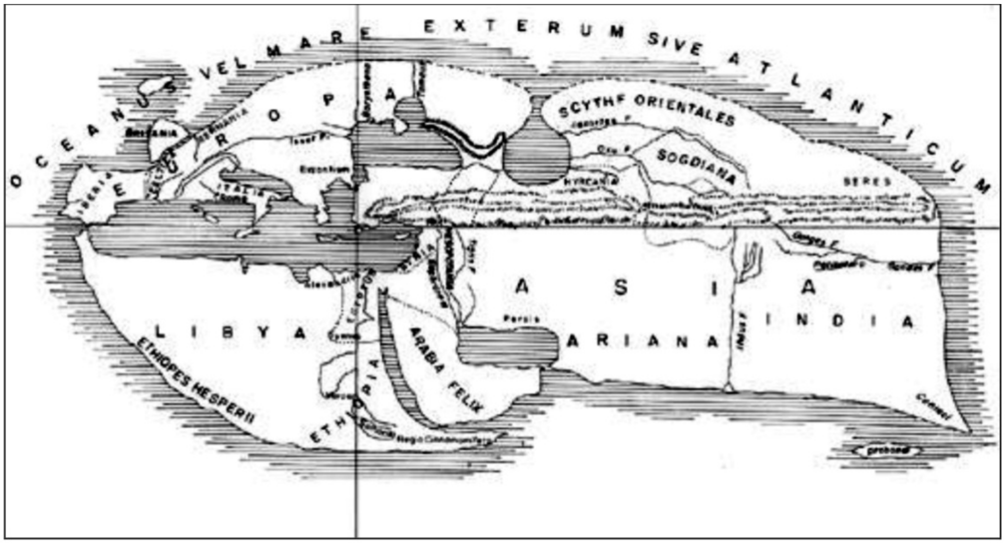

চিত্র-১.২.৩ : ষ্ট্রাবোর অংকিত পৃথিবীর মানচিত্র

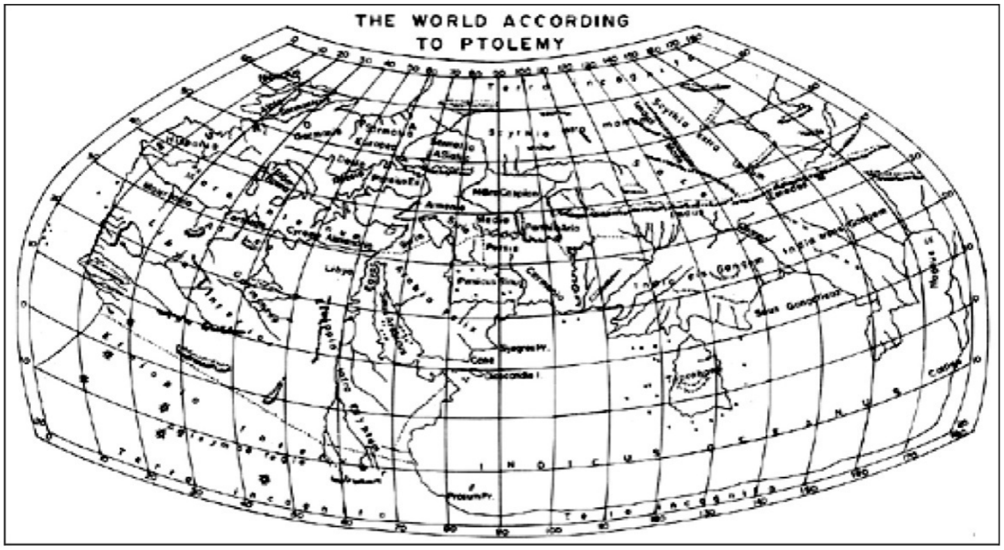

চিত্র ১.২.৪- ক্লডিয়াস টলেমির অংকিত পৃথিবীর মানচিত্র

ভারতীয় ভূগোলের উৎপত্তিতে ধর্ম বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

আদিযুগে ভারতেও ভূগোল চর্চা হয়েছে। ধারণা করা হয় যে, ভারতীয় ভূগোলের উৎপত্তিতে ধর্ম বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। আদিযুগের ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ ও পর্যটকদের ভ্রমনকাহিনী থেকে এই দেশের ভূগোল জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে, জ্যোর্তিশাস্ত্র, গাণিতিক ভূগোল ও মানচিত্র অংকনে ভারতীয়দের অবদানের কথা জানা যায়।

চৈনিক ভূগোলের
অবদান কি কি?

মধ্যযুগ

খ্রীঃ ৩০০-১৫০০।তীর্থযাত্রা ও পর্যটকদের ভ্রমণ।

মধ্যযুগে ভৌগোলিক ধারণার বিকাশে এক ধরনের স্থবিরতা আসে। এই যুগের স্থায়িত্বকাল খ্রিস্টীয় ৩০০ সাল থেকে প্রায় ১৫০০ সাল পর্যন্ত। মধ্যযুগের ভূগোল ধারণার অন্যতম উৎস ছিল তীর্থযাত্রা ও পর্যটকদের ভ্রমন বিবরণ। এই সব বিবরণে গ্রীক ও রোমানদের থেকে অর্জিত ভৌগোলিক জ্ঞানকে সম্প্রসারিত করার কোন প্রয়াস ছিল না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষ তথ্যের অভাব।

তাছাড়া, মিশনারী বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ইতস্ত বিক্ষিপ্ত তথ্যাদি থেকেও কিছু কিছু ভূগোল বিষয়ক ধারণা পাওয়া যেত। তবে ভৌগোলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা স্বীকার করা হয়। মুসলমানদের এসব অবদানের কথা নিচের সারণী ১.২.২ এ উল্লেখ করা হলো:

সারণী ১.২.২ : মুসলীম ভূগোলবিদদের অবদান (৭০০-১৫০০ সাল)

ভূগোলবিদ	অবদান
ইবনে ইউকাল (৯০০ সাল)	পৃথিবীর ক্রান্তীয় অঞ্চলে মানববসতি নাই এরূপ পুরাতন গ্রীক ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ করেন।
আল বলখি (৯২১ সাল)	পৃথিবীর প্রথম জলবায়ু সম্বন্ধীয় মানচিত্র (climatic atlas) তৈরী করেন।
আল মাসুদি (নবম শতাব্দীর শেষে)	মৌসুমী বায়ুর বিশদ বিবরণ দেন।
আল মাকদিসি (৯৮৫ সাল)	পৃথিবীকে ১৪টি জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করেন।
আল বিরুনী ও ইবনে সিনা	প্রাকৃতিক ভূগোল চর্চা করেন। ভারত ভ্রমন কিতাব আল হিন্দু পুস্তকে ভারত উপমহাদেশ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক তথ্য প্রকাশিত হয়।
আল ইদ্রিসি (১১৫৪)	রোমান পন্ডিত টলেমির অনেক ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমানিত করেন।
ইবনে বতুতা	মধ্য এশিয়া, ভারতবর্ষ ও চীন ভ্রমন করেন। ভ্রমনভিত্তিক বহু মূল্যবান ভৌগোলিক তথ্যাদি প্রকাশ করেন।
ইবনে খালদুন	মুসলিম রাজনৈতিক-ভৌগোলিক দর্শনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন।

মধ্যযুগ

মধ্যযুগের শেষভাগে শুরু হয় ইউরোপীয় দেশগুলোর সমুদ্র অভিযান। সমুদ্রের তটরেখা বরাবর পর্তুগীজ নাবিকগণ সমুদ্র অভিযান শুরু করে। এ সব নাবিকদের মধ্যে কলম্বাস, ভাসকো-ডা-গামা, বার্থোলোমিউ দিয়াজ, ম্যাগেলান উল্লেখযোগ্য। কলম্বাস নতুন দেশ আবিষ্কারের সাথে আটলান্টিকের সমুদ্র স্রোত ও বায়ু প্রবাহ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করেন। ভাসকো ডা গামা ভারতে পৌঁছবার সহজতম সমুদ্রপথ আবিষ্কার করেন। নতুন দেশ আবিষ্কার এবং তা উপনিবেশ হিসাবে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া চলে প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। এ সব আবিষ্কারের মাধ্যমে পৃথিবী সম্পর্কে বহু অজানা তথ্য জানার সুযোগ তৈরী হয়। এ সময় নৌ অভিযানের প্রয়োজনে মানচিত্র বিদ্যার ব্যাপক উন্নয়ন সাধন হয়। তাছাড়া, সমুদ্রে দিক নির্দেশনার জন্য প্রথমে **ক্রসস্টাফ,** পরে **অকট্যান্ট** এবং তা আরও পরিমার্জিত হয়ে **সেক্সট্যান্ট** নামক যন্ত্র আবিষ্কার হয়।

সমুদ্র অভিযান

সমুদ্রে থাকা অবস্থায় সঠিক দ্রাঘিমাগত অবস্থান ও সময় নির্ণয়ের জন্য এ সময় জন হ্যারিসন নামক একজন ব্রিটিশ নাবিক ১৭১৪ সালে পেন্ডুলাম ঘড়ি তৈরী করেন। ক্যাপ্টেন কুক ১৭৬৮ সালে ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ অংশে অষ্ট্রেলিয়া ও অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের অস্তিত্বের সঠিক অবস্থান গত ধারণা দেন।

মধ্যযুগের শেষভাগের সবচেয়ে বড় ভৌগোলিক আবিষ্কার হলো ভূকেন্দ্রিক ব্রহ্মাণ্ডের দৃষ্টিভঙ্গির ভ্রান্ত ধারণার পরিবর্তন। নিকোলাস কোপারনিকাস ১৪৯৭-১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে ধারণা দেন যে, সমস্ত গ্রহই সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। পরে কেপলার (১৬১৮ সালে) ও প্রমাণ করেন যে গ্রহগুলো সূর্যের চারিদিকে উপবৃত্তাকার পথে ঘোরে। গ্যালিলিও (১৬২৩ সালে) কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মত অভ্রান্ত বলে প্রমাণ দাখিল করেন।

নিকোলাস কোপারনিকাস, কেপলার, গ্যালিলিও

সপ্তদশ শতাব্দীর শুরু থেকে ভূগোল এর বিজ্ঞানভিত্তিক নতুন ধ্যান ধারণার উন্মেষ ঘটতে থাকে। এইক্ষেত্রে ভ্যারেনিয়াস ও ক্যান্টের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভ্যারেনিয়াসই প্রথম ভূগোল 'সাধারণ' ও 'বিশেষ' অংশে ভাগ করেন যা পরবর্তীতে 'প্রণালীবদ্ধ' (Systematic) ও 'আঞ্চলিক' (Regional) ভূগোল হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। 'সাধারণ' ভূগোল সমস্ত পৃথিবীকে ইউনিট

হিসাবে পাঠ করে কিন্তু 'বিশেষ' ভূগোলে পৃথিবীর এক একটি অঞ্চল ও দেশকে আলাদাভাবে জানার চেষ্টা করা হয়।

সাধারণ ও বিশেষ প্রণালীদ্ধ ও আঞ্চলক।

কান্ট প্রাকৃতিক ভূগোলকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দেওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানব সভ্যতার উন্নতিতে প্রাকৃতিক ভূগোলের বিশেষ ভূমিকা আছে। তাছাড়া, কান্ট প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ককে অবিচ্ছেদ্য হিসাবে দেখেছেন। তাঁর মতে ইতিহাসের ভিত্তিভূমি পানি ভূগোল।

সমগ্র অষ্টদশ শতাব্দীব্যাপী ভুগোলে প্রণালীবদ্ধ পদ্ধতির চর্চা হতে থাকে এবং প্রাকৃতিক বিষয়াবলীর প্রতি বেশী ঝোঁক দেখা যায়। এই সময়ের পূর্বে ভূমিরূপের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিপর্যয়বাদ (Catastrophism) দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে সামঞ্জস্যবাদ (Uniformitarianism) চালু হয়। এই মতবাদ অনুযায়ী ভূমিরূপ আকস্মিক কোন ভূ-আন্দোলনের কারণে নয় বরং ধীরে ধীরে নানান প্রক্রিয়ার কার্যকারণের ফলে বর্তমান ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান যে সব প্রক্রিয়া কার্যরত আছে, অতীতেও একই প্রাক্রিয়া কাজ করেছে। তাই, 'বর্তমানই অতীতের চাবি"(Present is the key to the past)।

ভূগোল এর বিকাশ সাধনে অষ্টাদশ শতাব্দী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই সময় বিজ্ঞানের এক স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে ভূগোল স্বীকৃতি পায়। তাছাড়া, এই বিষয়ের আওতায় কি পাঠ করা হবে, তা কিভাবে হবে এই নিয়েও যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়। রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ভূগোল ও প্রাকৃতিক ভূগোল এর পরিধি ও মিলনক্ষেত্র নিয়ে এই সময় বেশ বির্তক চলতে থাকে।

মধ্যযুগের মুসলমানদের ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রধান দিকগুলো কি কি?

আধুনিক যুগ

আধুনিক ভূগোলের গোড়াপত্তন হয় জার্মান ভূগোলবিদ আলেকজান্ডার ফন হুমবোল্ট ও কার্ল রিটারের মাধ্যমে। ভূগোল পাঠের পদ্ধতি নিয়ে উভয়ে মনে করতেন যে, কোন স্থানের ভৌগোলিক বিচার শুরু হবে সেই স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশে এর বর্ণনা দিয়ে, তারপরে প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ও অন্যান্য মানবীয় বিষয়াবলীর বর্ণনা দিতে হবে। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই পাঠ পদ্ধতি অনুসৃত হয়। এই পদ্ধতির লক্ষ্য হলো পরিবেশের জৈব ও অজৈব বিষয়ের মধ্যে অর্থপূর্ণ সম্পর্ক খুঁজে দেখা যা প্রাকৃতিক নিমিত্তবাদ হিসাবে চিহ্নিত হয়। ফলে, আধুনিক ভূগোলের শুরু থেকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় প্রাকৃতিক বিষয়গুলোকে তাদের প্রাকৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে রেখে এদের কার্যকারণ সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করা।

আলেকজান্ডার-ফন-হুমবোল্ট ও কার্ল রিটার

হুমবোল্ট ও রিটারের মৃত্যুর পর এদের মতবাদকে যারা সমুন্নত রাখার জন্য চেষ্টা করেছেন তম্মধ্যে ফ্রেডরিক রাটজেল ও এলেন সেম্পল অন্যতম। এরা উভয়ই মানব সমাজের প্রকৃতি নির্ধারণে পরিবেশের অপরিসীম নিয়ন্ত্রণ থাকে বলে রিটারের ধারণা সমর্থন করেন। এইভাবেই পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণ বাদ চালু হয়। রাটজেল মনে করতেন, মানব সমাজকে বুঝতে প্রথমে 'পরিবেশের শক্তিগুলোকে ভালভাবে জানা সবচেয়ে জরুরী। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই পরিবেশগত নিয়ন্ত্রনবাদের বিপরীতে ভৌগোলিকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় সম্ভাবনাবাদের (Possibilism) দিকে। কিভাবে প্রকৃতির বৈরী/প্রতিকূল অবস্থাকে খাপ খাইয়ে মানুষ প্রকৃতির বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়েছেন ভৌগোলিকগন তার ভিত্তিতেই সম্ভাবনাবাদ ধারণাকে এগিয়ে নিয়ে যান।

ফ্রেডারিক রাটজেল ও এলেন চার্চিল সেম্পল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ভূগোলে শুরু হয় মাত্রিক বিপ্লব (Quantitative Revolution)। এ বিপ্লবের প্রবক্তারা মনে করেন যে, ভূগোলকে আরো তাত্ত্বিক ভিত্তিতে দাঁড় করাতে হলে এতে আরও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার প্রয়োজন এবং তত্ত্বের দিকটি সরলভাবে গড়ে তোলা দরকার। সংখ্যাতাত্ত্বিক এ বিপ্লব ভূগোলকে ভাবমূলক (Ideographic) শাস্ত্র থেকে রীতিমূলক (Nomothetic) বিজ্ঞানে পরিণত করে। ভূগোলের এ মাত্রিক বিপ্লব সমীক্ষার পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যে মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। সংখ্যাতাত্ত্বিক কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ভৌগোলিকরা সাধারনীকরণ সূত্র ও তত্ত্ব গঠন, মডেল নির্মাণের এবং ক্ষেত্রবিশেষে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়ার প্রতি অধিকতর মনোযোগী হন। এ সব ভূগোলবিদদের মধ্যে চরলে, পিটার হেগেট, উইলিয়াম বাংগে, ব্রায়ান ব্যারী অন্যতম। ভূগোলের এ ধারা এখনও অব্যাহত আছে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার ও তত্ত্বের সরল উপস্থাপনা

আধুনিক ভূগোলে হুমবোল্ড ও রিটার কি জন্য বিখ্যাত?

পাঠ সংক্ষেপ

ভূগোল বিষয়ের বিকাশকে কালক্রম, বিষয়ভিত্তিক ও পর্যায়ভিত্তিক এ তিনভাবে প্রকাশ করা যায়। ভূগোল চর্চার আদি যুগে প্রাকৃতিক ও গাণিতিক ভূগোল জ্ঞান সমৃদ্ধ ছিল। মধ্যযুগে ভূগোল চর্চায় স্থবিরতা আসে। এ সময় ভৌগোলিক জ্ঞান বিস্তারে মুসলমানগণ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। বিশেষত: পৃথিবীর জলবায়ু, ক্রান্তীয় অঞ্চলের মানব বসতি সম্পর্কিত ধারণা ও মৌসুমী জলবায়ু সংক্রান্ত ধারণার ব্যাপক অগ্রগতি হয়। আধুনিক যুগের শুরুতে প্রাকৃতিক নিমিত্তবাদ-এর প্রচলন ঘটে। তবে, বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই নিমিত্তবাদের বিপরীতে সম্ভাবনাবাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। এ সময় ভূগোল জ্ঞান চর্চা সংখ্যাতাত্ত্বিক বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হয় এবং বর্তমানে তা আরও পরিশীলিত হয়ে তত্ত্বগঠন ও মডেল নির্মাণের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১. **সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন** (সময়- ৩ মিনিট)।

১.১ ভূগোল যাত্রার শুরু-

ক. গ্রীকদের   খ. রোমানদের   গ. মুসলমানদের থেকে

১.২ গ্রীকদের প্রস্তাবিত পৃথিবীর জলবায়ু অঞ্চল-

ক. ৩টি   খ. ৪টি   গ. ৫টি

১.৩ পৃথিবীর সঠিক আয়তন প্রথম পরিমাপ করেন-

ক. হেরোডোটাস   খ. ইরেটোসথেনিস   গ. ক্লডিয়াস টলেমি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (সময় ৬ মিনিট)ঃ

১. প্রাকৃতিক নিমিত্তবাদ বলতে কি বুঝায়?

২. সম্ভাবনাবাদের ধারণাটি কি বুঝায়?

৩. ভ্যারিনিয়াস এর প্রণালীবদ্ধ ও আঞ্চলিক ভূগোল ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. গ্রীক ও রোমান যুগের ভূগোল জ্ঞানের বিভিন্ন দিক আলোচনা করুন।

২. মধ্য যুগের ভূগোল সম্পর্কে ধারণা দিন।

৩. ভূগোলের আধুনিক যুগ সম্পর্কে লিখুন।

পাঠ ১.৩ : ভূগোল বিষয়ের পরিধি (Scope of Geography)

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে–

- ◈ প্রাকৃতিক ও মানবিক ভূগোল কি;
- ◈ ভূগোলের উপ-বিভাগসমূহ;
- ◈ ভূগোলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে।

ভূগোল চর্চা দুটো মূল ধারায় বিভক্ত: প্রাকৃতিক ও মানবিক ভূগোল। যে সব ভূগোলবিদ প্রাকৃতিক ভূগোল চর্চা করেন তাদের মূখ্য বিষয় প্রাকৃতিক বিষয়াদি। যেমন– শিলা, ভূমিরূপ, নদ-নদী, জলবায়ু, মৃত্তিকা ইত্যাদি। আবার, মানবিক ভূগোলবিদগণ মানুষ ও তার কর্মকান্ড সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করেন। প্রাকৃতিক কিংবা মানবিক ভূগোল এ উভয় শাখায়ই ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে; ফলে উভয় ক্ষেত্রেই বহু উপবিভাগ গড়ে উঠেছে। নিচের ছবিতে (চিত্র-১.৩.১) আধুনিক ভূগোলের উপবিভাগসমূহ ও এদের সমগোত্রীয় বিষয়সমূহ দেখানো হয়েছে। ছবিতে লক্ষ্যণীয় যে, ভূগোলের প্রতিটি উপভাগ (যেমন– প্রাকৃতিক ভূগোল, অর্থনৈতিক ভূগোল, আচরণগত ভূগোল) এর সমগোত্রীয় বিষয়ের সাথে নিবীড়ভাবে সংযুক্ত। যেমন, প্রাকৃতিক ভূগোল, ভূ-তত্ত্ব, আবহাওয়া বিদ্যা এবং জীববিদ্যার সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত। আবার আচরণগত ভূগোল নৃতত্ত্ববিদ্যা এবং রাজনৈতিক ভূগোল রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত।

ভূগোলের দুটি ধারা-প্রাকৃতিক ও মানবিক।

চিত্র ১.৩.১ : আধুনিক ভূগোলের উপবিভাগসমূহ ও এদের সমগোত্রীয় বিষয়সমূহ।

উচ্চতর পর্যায়ে ভূগোলের এ উপভাগ সত্ত্বেও এ বিষয়ের মূল বক্তব্য নিয়ে এখনও অস্পষ্টতা রয়ে গেছে, বিশেষত স্কুল থেকে কলেজ পর্যায়ে। ভূগোলের এই পরিচয়গত অস্পষ্টতা দূরীকরণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে '৭০ এর দশকে ভূগোল বিষয়ক উপদেষ্টা প্যানেলকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর রিপোর্টটি করতে বলা হয়।

ক. ভূগোল এর প্রকৃতি কি? অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞান,
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও মানবিক বিষয়ের সাথে এর সম্পর্ক কি?
খ. বিষয়টির সামাজিক মূল্য ও লক্ষ্য কি?

উপর্যুক্ত বিষয়ের উপর উপদেষ্টাগণ প্রথমেই ভূগোলের পরিধি কি তা চিহ্নিত করেন। ভূগোলের পরিধি ব্যাখ্যায় তারা নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করেন।

ক. ভূগোল পাঠের প্রয়োজনীয়তা কি?

স্থানিক বিণ্যাস, প্রপঞ্চ, বিবিধের মধ্যে ঐক্য।

ভূগোলের প্রধান আলোচ্য বিষয় স্থানিক বিন্যাস (Areal arrangement)। এর প্রধান কার্যক্ষেত্র ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ এবং লক্ষ প্রাকৃতিক-সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহের বন্টনগত তারতম্যের বিন্যাস, এর সাথে যুক্ত নিয়ামকসমূহ চিহ্নিত করে এগুলোর প্রভাব ব্যাখ্যা করা এবং তাদের আন্ত:সম্পর্ক তুলে ধরা। ভৌগোলিক জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন প্রপঞ্চের (Phenomena) আপাত: বিশৃঙ্খল বিন্যাসের মধ্যে একটি শৃঙ্খল বিন্যাস প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে। ভূগোল বিবিধের মধ্যে ঐক্য (Unity in Diversity) খুঁজে পেতে সাহায্য করে।

বিবিধের মধ্যে ঐক্য কি?

খ. ভূগোলবিদের ব্যবহৃত ব্যাখ্যদান পদ্ধতিতে অন্যদের সাথে তফাত কোথায়?

ভূগোলবিদগণ তথ্য আহরণ ও ব্যাখ্যাদানে তিন ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করেন। যথা: উৎপত্তিগত বা ঐতিহাসিক, কর্মভিত্তিক এবং অবরোহী পদ্ধতি।

১. উৎপত্তিগত বা ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে কোন বস্তু বা বিষয় সূত্রপাত এবং এর বিকাশ লাভের ক্রমধারা জানার চেষ্টা করা হয়। যেমন, বাংলাদেশের হাওড় এলাকায় গমের পরিবর্তে কেন বোরো ধানের চাষ করা হয় বা সিলেটের টিলাগুলোতে ইক্ষু চাষের পরিবর্তে কেন চা গাছ লাগানো হয়। আবার, চট্টগ্রাম ও মঙ্গলায় কেন সমুদ্রবন্দর বা নারায়নগঞ্জে কেন নদী বন্দর ও পাট শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে।

তথ্য আহরণ ও ব্যাখ্যাদান।

২. কর্মভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে কোন বিষয় কিভাবে কাজ করে, এর অংশ বিশেষসমূহ কি কি এবং আলাদা আলাদা এবং সার্বিকভাবে এইগুলোর কাজ কি তা জানার চেষ্টা করে থাকে। যেমন, কার্যভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে একটি শহরকে শিল্প এলাকা, বসতি এলাকা, প্রশাসনিক এলাকা ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক এলাকায় ভাগ করা যায়। একটি নগরের কাজ তার পার্শ্ববর্তী বা পশ্চাৎদ ভূমির গ্রামীণ অধিবাসীদের সেবা প্রদান করা। একটি নদীর কাজ তার তীরবর্তী এলাকায় গড়ে ওঠা নগর/গ্রামীণ বসতির মালামাল পরিবহনে সহায়তাদান, প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ করা এবং বিনোদনের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার।

৩. অবরোহী পদ্ধতিতে পৃথিবী পৃষ্ঠের বিভিন্ন বিষয়ের বন্টনে একটি বিধিবদ্ধ নিয়ম/ধারা খুঁজে পেতে সাহায্য করে। যেমন, ভূমিরূপের গাণিতিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে নিষ্কাশন ঘনত্ব: ভূমি গঠন, ভূমির বন্ধুরতা, উচ্চতা, ভূ-আচ্ছাদন ইত্যাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ভৌগোলিক তথ্য আহরণে কি কি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়?

গ. ভূগোলবিদগণ কি জানতে চান?

১. ভূগোলে স্থান - আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য জানার চেষ্টা করা হয় ঃ

১.১ কি, কোথায় তার বর্ণনা দেয় - একটি স্থানের অতীতসহ বর্তমানের বিশদ/সামগ্রিক বিষয়াদি এর অন্তর্ভূক্ত।

ভূগোলে স্থান, বিষয়ভিত্তিক, সময় ভিত্তিক, স্থানিবন্টনের বৈশিষ্ট্যাবলী, মানুষ-ভূমির সম্পর্কে, মানচিত্রাঙ্কন বিদ্যা, সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতির

১.২ ঐ স্থানের বিশেষত্ব, উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যাবলী কি এবং ব্যাতিক্রমী বিষয়গুলো তুলে ধরে। ভূগোলে ঐ স্থানের বিষয়ভিত্তিক বন্টন, সংযুক্ততা ও বিভিন্ন সহযোগী অংশবিশেষ এর আন্ত:সম্পর্ক বিশ্লেষনের মাধ্যমে স্থানের বিশেষত্বর কারণ উদঘাটনে সচেষ্ট হয়।

১.৩ ঐ স্থানের সমবৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এলাকাগুলোকে চিহ্নিত করে এইগুলোকে পৃথক পৃথক অঞ্চলে ভাগ করার চেষ্টা করে। যেমন:

- ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চল
- জলবায়ু অঞ্চল
- ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চল
- নগর অঞ্চল
- কৃষি অঞ্চল
- উদ্ভিজ্জ অঞ্চল

২. ভূগোলে বিষয়ভিত্তিক জানার চেষ্টা করা হয় ঃ

২.১ এ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক কিংবা মানবিক বিষয় হতে পারে, যদিও উভয় ক্ষেত্রই পরস্পরে সম্পর্কিত।

২.১.১ প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে ভূগোলবিদগণ ভূমিরূপ, জলবায়ু, পানি, উদ্ভিদ, প্রাণী, মৃত্তিকা, শিলা ও খনিজ ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিবেচনা করে থাকেন।

২.১.২ মানবিক ক্ষেত্রেও বিশেষায়ন হয়েছে। এক্ষেত্রে মানুষের বন্টন এবং তাঁর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও তাদের সংগঠনসমূহের ব্যাখ্যাদান করে থাকে। এর আওতাভূক্ত অর্থনীতিক ভূগোল, রাজনৈতিক ভূগোল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভূগোল, বসতি ভূগোল, নগর ভূগোল ইত্যাদি।

২.২ প্রাকৃতিক বা মানবিক বিষয়সমূহ জানার ক্ষেত্রে ঐ স্থানের যে সব বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় তা নিম্নরূপ:

ক) এদের অবস্থান খ) স্থানিক বন্টন গ) প্রবাহ/বহমানতা, চলাচল, ব্যাপন এবং আন্ত: সম্পর্ক।

৩. ভূগোলে সময়ভিত্তিক কোন স্থান বা বিষয়ের পরিবর্তন ধারা এবং এ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াসমূহ জানার চেষ্টা করে যা ঐতিহাসিক ভূগোল হিসাবে বিবেচিত হয়।

৪. ভূগোলে কোন বিষয়ের স্থানিক বন্টনের বৈশিষ্ট্যাবলী, ধরন, ঘনত্ব, আকার, বিন্যাস সম্পর্কে জানার চেষ্টা করে।

৫. ভূগোলবিদগণ মানুষ-ভূমির সম্পর্ক জানতে সচেষ্ট হয় যা মানব বাস্তুবিদ্যা নামে পরিচিত।

মানব বাস্তুবিদ্যা

৬. ভূগোলে ভূ-পৃষ্ঠের নানান বিষয়াদি কিভাবে মানচিত্র বা গ্লোবে তুলে ধরা যায় তার চেষ্টা করে থাকে, যা মানচিত্রাংকন বিদ্যা নামে পরিচিত। ভূগোলবিদগন বিভিন্ন কৌশল উদ্ভাবনের মাধ্যমে স্থানিক বিষয়সমূহের গ্লোব কিংবা মানচিত্রে নির্ভুল অবস্থান, বন্টন, গমন পথ ইত্যাদি প্রদর্শনের বিভিন্ন কৌশল উদ্ভাবন করেছেন।

মানচিত্র কি কাজে লাগে?

জি, আই, এস

৭. ভূগোলবিদগণ স্থান বা অঞ্চল গবেষণায় বিভিন্ন ধরনের সংখ্যাভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার ও উন্নয়ন সাধন করেছে, তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের শ্রেনী বিভাজন, আকাশ চিত্র, ভূ-উপগ্রহ চিত্র, মডেল ব্যবহার কৌশল অবলম্বন করেছেন। অতিসম্প্রতি, জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (জি,আই,এস) নামক কম্পিউটার ভিত্তিক কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে উপাত্ত সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ, সমন্বয় সাধন ও ব্যবস্থাপনা এবং স্থান-সময়ভিত্তিক পরিবর্তন ধারা মানচিত্রায়নে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছেন।

ঘ. **ভূগোলবিদগণ পৃথিবী সম্পর্কে কি ধরনের জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ করে থাকেন?**

১. তাঁরা যে ক্ষেত্রে জ্ঞান ও ধারণা যোগাতে সাহায্য করে;

- ভূ-পৃষ্ঠের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যাবলী,
- ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন বিষয়ের স্থানিক দিক,
- বন্টন বৈশিষ্ট্যাবলী।

২. ভূগোলবিদগণ মানচিত্র অংকন, সংখ্যাতাত্ত্বিক, শ্রেণী বিভাজন ও অন্যান্য কৌশল উদ্ভাবন করেছেন যা উপরের প্রতিটি বিষয় বর্ণনা, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঙ. ভূগোলবিদগণ বাস্তব পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক, মানবিক বিষয়াদির আন্তঃ সম্পর্কিত বিষয়ভিত্তিক তাত্ত্বিক মডেল দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন।

পাঠ সংক্ষেপ

ভূগোলের দুটি ধারা: প্রাকৃতিক ও মানবিক। ভূগোলের প্রধান আলোচ্য বিষয় ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের স্থানিক বিন্যাস অনুসন্ধান এবং প্রাকৃতিক-সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চ সমূহের আন্ত:সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা। বিবিধের মধ্যে ঐক্য অনুসন্ধান এবং অন্যতম লক্ষ্য। ভূগোলবিদগণ তথ্য আহরনে ও ব্যাখ্যা দানে একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন। যেমন: উৎপত্তিগত, কর্মভিত্তিক ও অবরোহী পদ্ধতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন (সময়- ৩ মিনিট)ঃ

১.১ ভূগোলে স্থানিক বিন্যাস এর প্রধান কার্যক্ষেত্র ভূ-পৃষ্ঠের-

ক. উপরিভাগ খ. অভ্যন্তর ভাগ গ. মাঝামাঝি

১.২ ভূগোলবিদগণ তথ্য আহরণ ও ব্যাখ্যাদানে-

ক. দুই খ. তিন গ. চার ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করেন

১.৩ সময় ভিত্তিক কোন স্থান বা বিষয়ের পরিবর্তন ধারা এবং এ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াসমূহ ভূগোলের যে শাখায় জানার চেষ্টা করা হয় তাকে-

ক. ঐতিহাসিক খ. প্রাকৃতিক গ. সামাজিক ভূগোল বলে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (সময় ৬ মিনিট) ঃ

১. স্থানিক বিন্যাস বলতে কি বুঝায়?

২. ভূগোলবিদগণ কি জানতে চান?

৩. ভূগোল বিষয় পৃথিবী সম্পর্কে কি ধরনের জ্ঞান দান করে থাকে?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. ভূগোলের পরিধি সবিস্তারে আলোচনা করুন?

পাঠ ১.৪ : পরিবেশঃ অর্থ, প্রকৃতি ও উপাদানসমূহ

(The Environment : Meaning, Nature and Components)

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে–

◈ পরিবেশ এবং পরিবেশের প্রকৃতি সম্পর্কে।

পরিবেশের সংজ্ঞা

জৈব ও অজৈব পদার্থের সমন্বয়ে পরিবেশ গঠিত।

ভূপৃষ্ঠস্থ দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য যাবতীয় জৈব ও অজৈব পদার্থের সমন্বয়ে পরিবেশ গঠিত। অজৈব পদার্থের আওতাভূক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে পানি, বায়ুমন্ডল ও শিলা-মৃত্তিকা অন্যতম। বায়ুমন্ডল অদৃশ্য হলেও, শিলা-মৃত্তিকা ও পানি দৃশ্যমান। পানি, বায়ুমন্ডল ও শিলা-মৃত্তিকা সম্মিলিতভাবে জৈব পরিবেশের ভিত্তি গড়ে তুলেছে। পরিবেশকে তার গঠন মৌলের আলোকে জৈব ও অজৈব এ দুই পরিবেশে ভাগ করা যায়। অজৈব পরিবেশ মূলতঃ প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলে। পানি, শিলা ও বায়ুমন্ডল প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রধান গঠনকারী উপাদান। অপরদিকে, এ সব প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠনকারী উপাদানই আবার সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের গঠন ভিত্তি গড়ে তোলে এবং শক্তি ও খনিজ জোগানের মাধ্যমে পরিবেশ টিকিয়ে রেখেছে।

পরিবেশের প্রকৃতি

পরিবেশের প্রকৃতি বলতে এর গঠনকারী উপাদানসমূহের প্রকৃতিই বুঝানো হয়। প্রাকৃতিক ও জৈব এই উভয় পরিবেশই আপাতঃ সহজ মনে হলেও তা অত্যন্ত জটিল এবং এদের গঠন উপাদানসমূহ পরস্পরে নিবীড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। নিম্নে এসব প্রাকৃতিক ও জৈব পরিবেশের বিভিন্ন গঠন উপাদানসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

ভূমি-শিলা ও খনিজের সমন্বয়ে গঠিত।

ভূমিঃ প্রাকৃতিক পরিবেশ এর অন্যতম গঠন মৌল ভূমি, যা শিলা ও খনিজের সমন্বয়ে গঠিত। ভূ-পৃষ্ঠের কঠিন বহিরাবরনই বিভিন্ন ধরনের শিলায় গঠিত। এ সব বিভিন্নধর্মী শিলা ভূ-প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার সাথে মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন অবয়বের ভূমিরূপ গঠন করে থাকে। এসব ভূমিরূপ কোথাও যেমন কঠিন, কোথাও নরম শিলার, আবার অন্যত্র উভয়ের সংমিশ্রণে গঠিত হতে পারে। আবার, ভূমিরূপের প্রকৃতি কোথাও সুউচ্চ পার্বত্যময় বা পাহাড়ি; আর কোথাও মৃদু ঢালবিশিষ্ট। ভূমিরূপের এ আকার, আকৃতি ও গঠন প্রকৃতি যে প্রাকৃতিক পরিবেশীয় কাঠামো সৃষ্টি করে তা সব প্রাণী কিংবা উদ্ভিদের জন্য সমানভাবে উপযোগী নয়। তাই, ভূমিরূপ যেমন বৈচিত্রময়, তেমনি প্রাণী ও উদ্ভিদের স্থানভেদে বন্টন বৈচিত্র লক্ষণীয়। যেমন, হিমালয়ের বিস্তৃত পার্বত্য এলাকায় যে সব প্রাণী বাস করে তা বাংলাদেশের মত সমতল ভূমিতে দেখা যায় না। আবার, পার্বত্য এলাকার গাছপালার ধরনও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সমতল ভূমির অনুরূপ নয়। একইভাবে উষর মরুভূমির প্রাণী কিংবা উদ্ভিদজ প্রকৃতিও পাহাড়ী পরিবেশের চেয়ে ভিন্ন। তবে, এখানে উল্লেখ্য যে প্রানী কিংবা উদ্ভিদের বন্টন বৈচিত্রের জন্য শুধুমাত্র ভূমিরূপ এককভাবে দায়ী নয়, আরো অনেক নিয়ামক এর সাথে জড়িত।

পরিবেশের প্রকৃতি বলতে কি বুঝায়?

পানিঃ ভূপৃষ্ঠের তিনভাগই পানির আওতায়। সমুদ্রই পানির প্রধান উৎস। তাছাড়া, তুষার আচ্ছাদিত মেরু দেশীয় ভূখন্ড ও উচ্চ পার্বত্য এলাকার বরফাচ্ছন্ন এলাকাসমূহ, নদ-নদী, হ্রদ, জলাভূমি পানির অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উৎস। পানি, প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ উভয়েরই টিকে থাকার অন্যতম উপাদান। পানির উৎসকে কেন্দ্র করেই প্রাচীন মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছে। উম্মুক্ত ভূপৃষ্ঠের পানি সূর্যালোক থেকে প্রাপ্ত শক্তির মাধ্যমে বাস্পায়িত হয়ে বিভিন্ন জীব ও জৈব স্তরের মাধ্যমে আবার তা ভূপৃষ্ঠেই ফিরে আসে, যা পানি চক্র নামে পরিচিত। এ পানি চক্র শক্তি স্থানান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মোট কথা, পানি জীবজগতকে সচল রাখে।

৩ ভাগ পানি, একে কেন্দ্র করে সভ্যতা

বায়ুমন্ডলঃ ভূঅভ্যন্তর থেকে বের হওয়া গ্যাসীয় পদার্থ থেকেই বায়ুমন্ডলের সৃষ্টি। এর প্রধান গ্যাস নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, আরগন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং সামান্য পরিমাণে অন্যান্য গ্যাস আছে। বায়ুমন্ডল সম্পূর্ণ ভূ-গোলক মুড়িয়ে রেখেছে এবং মাধ্যকর্ষন শক্তির কারনেই তা পৃথিবীর সাথে লেপটে আছে। বায়ুমন্ডলের পুরুত্ব বিষুবীয় অঞ্চলে বেশী এবং মেরু অঞ্চলে সব চেয়ে কম। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৮০ কি:মি: উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুমন্ডলের গ্যাসীয় মিশ্রণ প্রায় সমান। বায়ুমন্ডলীয় গ্যাস, অক্সিজেন সমস্ত জীব জগতের অস্তিত্বের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বায়ুমন্ডলীয় অবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ামকসমূহের মধ্যে সূর্যালোক, উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ ও মেঘ গুরুত্বপূর্ণ। এ সব নিয়ামকের পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া থেকেই জলবায়ুর উদ্ভব। বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর ব্যাপক তারতম্য আছে। জীবজগতের বন্টন গত বৈশিষ্ট্যে জলবায়ুগত বৈচিত্র্যের যোগসূত্র সুস্পষ্ট।

গ্যাসীয় পদার্থ থেকে বায়ুমন্ডলের সৃষ্টি।

পৃথিবীর জৈব জলবায়ুজ (Bioclimatic) পরিবেশের ভিন্নতা অনুযায়ী বিষুবীয় অঞ্চল থেকে উত্তর ও দক্ষিণের উভয় গোলার্ধে উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন অক্ষাংশীয় অঞ্চলে ভাগ করা যায়। এসব জৈব জলবায়ুজ পরিবেশের বৈচিত্রতা প্রাণী ও উদ্ভিদের বন্টনে অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে।

জীবজগতের অন্যতম প্রাণী, মানুষ। মানুষের সংখ্যা বিশ্বব্যাপী বর্তমানে প্রায় ৬ বিলিয়ন (ছয়শত কোটি) যা পৃথিবীর ভূভাগের প্রায় ৩০ শতাংশ জুড়ে আছে। বাকী ৭০ শতাংশ ভূভাগে জনবসতি খুবই পাতলা বা জনমানবশূন্য। হালকা বসতি এলাকায় মানুষজন মৎস্য আহরণ, শিকার, সংগ্রহকরণ, পশুচারণ এবং সামান্য ফসল আবাদের সাথে যুক্ত। এ সব জনবসতি মূলত: তিনটি প্রাকৃতিক পরিবেশে দেখা যায়: এশিয়া ও আফ্রিকার মরুময় এলাকায়, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ক্রান্তীয় অঞ্চলে এবং এশিয়া ও উত্তর আমেরিকার শীত প্রধান এলাকায়। গত কয়েক হাজার বছর ধরে এ সব জনগোষ্ঠি প্রকৃতির সাথে খাপ-খাইয়ে প্রায় প্রাকৃতিক জীবন-যাপন করছে। তবে, বর্তমানে এদের জীবন যাত্রায় আধুনিকতার সংস্পর্শে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসছে।

পৃথিবীর ভূভাগের প্রায় ৩০ শতাংশ জুড়ে মানুষ বসবাস করে।

ঘনবসতির জনগোষ্ঠি মধ্য অক্ষাংশে ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বসবাস করে। উত্তর গোলার্ধের ২০° থেকে ৫০° অক্ষাংশের মধ্যে প্রায় ৪০০ কোটি মানুষ বসবাস করে। ঘনবসতিপূর্ণ জনপদসমূহের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক লোকই সমুদ্র উপকূলের ১০০ কি.মি. এর মধ্যে বসবাস করে। পৃথিবীর প্রধান ১০টি বৃহৎ নগরীর ৯টিই সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত।

বিভিন্ন কারণে মানুষ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না। ফলে, ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। যেমন, বাড়তি জনসংখ্যার প্রয়োজনে প্রতিদিন অধিক হারে ভূমি ও সম্পদের যোগান দরকার হচ্ছে, যার বেশ কিছুই নবায়ন যোগ্য নয়। এতে, মৃত্তিকার উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে, বনভূমি উজাড় হচ্ছে। জ্বালানি ভান্ডার নিঃশেষ হচ্ছে, জলাধার সংকোচিত হচ্ছে এবং জীব বৈচিত্র্য দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। ধারণা করা হয় বিশ্বের জনসংখ্যা ২০০ কোটিতে (১৯৩০ সন) পৌঁছাতে

জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে পরিবেশে বিরূপ

১ লক্ষ বছর লাগলেও তা বেড়ে ৪০০ কোটিতে পৌঁছাতে লেগেছে মাত্র পরবর্তী ৪৬ বৎসর। বর্তমানে, প্রতি বছর ৯০ মিলিয়ন লোক বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জনসংখ্যার অনিয়ন্ত্রণ পরিবেশে মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

অনেকেরই অভিমত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত পৃথিবী বাসপোযোগী রাখা দু:সাধ্য হবে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, উন্নত যন্ত্র, নতুন রাসায়নিক পদার্থ এবং নতুন ভূমি ব্যবহারের অনেক কিছুই সবক্ষেত্রে পরিবেশ উপযোগী না হওয়ায়, বাস্তু পদ্ধতিতে, পানি কিংবা বায়ুমন্ডলীয় পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়। ভৌগোলিকভাবে পৃথিবী, পানি, ভূমি ও বায়ুমন্ডল এবং এর জৈব মন্ডল নিয়ে একটি সুসমন্বিত গ্রহ। ফলে, যে কোন স্থানের অজৈব বা জৈব মন্ডলীয় কোন পরিবর্তন বহুদূরের পরিবেশকেও তা প্রভাবিত করে থাকে। বিশেষ করে, তা বায়ুমন্ডলের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যেমন, কোন মহাদেশের একটি আগ্নেয়গিরির উদগীরিত লাভা বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে যেতে পারে এবং তা বহুদিন জলবায়ুকে প্রভাবিত করে। তাছাড়া, শিল্প উন্নত দেশ থেকে যে বিপুল পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও ক্লোরো-ফ্লোরো কার্বন (CFC) বায়ুমন্ডলে যাচ্ছে তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। এর প্রমাণ স্বরূপ, CFC এর কারণে এন্টার্কটিকা মহাদেশের স্ট্রেটোমন্ডলের ওজন স্তরের পুরুত্ব ঋতুভিত্তিক হ্রাস পাচ্ছে। অথচ, এই মহাদেশটিতে অন্য সব মহাদেশের চাইতে বিশুদ্ধ পরিবেশ বিরাজ করে।

তাই পরিবেশ সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে ভৌগোলিকভাবে পৃথিবীর এ সমন্বিত প্রকৃতিকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা আশু প্রয়োজন।

পাঠ সংক্ষেপ

গঠনমৌলের আলোকে জৈব ও অজৈব পদার্থের সমন্বয়ে পরিবেশ গঠিত। অজৈব পরিবেশ মূলত: প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলে। পানি, শিলা ও বায়ুমন্ডলের প্রধান গঠন উপাদান। আবার, এ সব প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠনকারী উপাদানই সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের গঠন ভিত্তি গড়ে তোলে এবং শক্তি ও খনিজ জোগানের মাধ্যমে জৈব পরিবেশ টিকিয়ে রেখেছে। পৃথিবীর জৈব পরিবেশ যে সব বহুবিধ কারণে হুমকির সম্মুখিন, তম্মধ্যে বিপুল জনসংখ্যা অন্যতম। অধিক জনসংখ্যার কারণে নবায়নযোগ্য নয় এমন সম্পদের উপর বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান চাপ বাড়ছে; ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ আজ বিপন্ন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১. **সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন** (সময়- ৩ মিনিট) ঃ

১.১ ভূপৃষ্ঠের কঠিন বহিরাবরন বিভিন্ন ধরনের-

ক. শিলায় খ. উদ্ভিজ্জের গ. প্রাণীর - সমন্বয়ে গঠিত

১.২ পানির প্রধান উৎস-

ক. নদ-নদী খ. সমুদ্র গ. পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ

১.৩ বায়ুমন্ডলীয় গ্যাসের প্রধান উৎস-

ক. পৃথিবীর প্রাণী জগত খ. প্রাণী ও উদ্ভিজ্জ গ. পৃথিবীর অভ্যন্তরে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী (সময় ১২ মিনিট) ঃ

১. পরিবেশ বলতে কি বুঝায়?

২. জৈব ও অজৈব পরিবেশে পার্থক্য কি?

৩. হালকা জনবসতির বন্টন উল্লেখ করুন। এসব এলাকার লোকদের পেশা কি কি?

৪. ঘনবসতির বৈশিষ্ট্য কি?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. পরিবেশের অর্থ, প্রকৃতি ও তাৎপর্য আলোচনা করুন।

পাঠ ১.৫ : ভূগোলে পরিবেশ (Environment in Geography)

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে–

◈ ভূগোল ও পরিবেশ সম্পর্কে।

মানুষ ও পরিবেশ ভূগোলের প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

ভূগোলের অন্যতম আলোচ্য বিষয় মানুষ ও পরিবেশ। মানুষ ও পরিবেশ এর সম্বন্ধ নিয়ে ভূগোল চর্চার বয়স অনেক পুরানো। তবে মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্কে মানুষের স্থান কোথায় অর্থাৎ মানুষ পরিবেশের উপর নির্ভরশীল নাকি মানুষ তার শ্রম ও মেধা দ্বারা পরিবেশকে ব্যবহার উপযোগী করে এর বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগায়; এ নিয়ে মতদ্বৈততা ভূগোলে অনেক পুরানো। কিন্তু মানুষ পরিবেশ সম্পর্ক নিয়ে মত পার্থক্য যাই থাকুক না ভূগোলে পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ব্যাপারে প্রায় সবাই একমত।

ভূগোলের প্রধান দুটি ধারা- প্রাকৃতিক ও মানবিক। প্রাকৃতিক ভূগোল এর আলোচ্য বিষয়গুলোকে পৃথকভাবে বিবেচনা করা হলে দেখা যায় এর প্রধান বিষয় ভূমি, পানি ও বায়ুমন্ডল। প্রাকৃতিক ভূগোলের এই তিনটি বিষয় নিয়েই প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে। ভূমিকে প্রধান বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হয় প্রাকৃতিক ভূগোলে। পৃথিবীর প্রধান ভূমিরূপ, এদের উৎপত্তি, গঠন পরিবেশ ও কাঠামো নিয়ে ভূমিরূপবিদ্যা নামক একটি উপবিভাগ গড়ে উঠেছে। এ ভূমিরূপ বিদ্যায় কোন ভূমি গঠনে যে ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব প্রক্রিয়া কার্যকারণের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে থাকে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রধান উপাদানগুলো কি কি?

মৃত্তিকার বন্টন, উৎপত্তি ও কৃষিতে এর গুরুত্ব।

তাছাড়া, মৃত্তিকা ভূগোল নামক বিষয়ে বিশ্বের মৃত্তিকাসমূহের বন্টন, উৎপত্তি ও কৃষিতে এসব মৃত্তিকার গুরুত্ব বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়। এছাড়া, মৃত্তিকাসমূহ যে সব প্রাকৃতিক পরিবেশে এর সর্বোচ্চ উপযোগিতা যোগায় তা জানা, কি ধরনের মানবিক কর্মকান্ডের কারণে মৃত্তিকার উর্বরতা নষ্ট হয় তা মৃত্তিকা ভূগোলে তুলে ধরা হয়। মোট কথা, মৃত্তিকা ভৌত পরিবেশের একটি অংশ হিসাবে মৃত্তিকা ভূগোল এ বিশদভাবে জানার চেষ্টা করা হয়।

বায়ুমন্ডলের গঠন উপাদান, উৎপত্তি ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে আলোচনা।

আবার, বায়ুমন্ডল ও প্রাকৃতিক পরিবেশের একটি গঠন উপাদান। ভূগোলের জলবায়ু ও আবহাওয়া বিদ্যায় বায়ুমন্ডলের গঠন উপাদান, উৎপত্তি ও ব্যাপ্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়। আবহাওয়া ও জলবায়ুর গঠন উপাদানসমূহের বন্টনগত তারতম্য বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর শ্রেণী বিভাগ জলবায়ু ভূগোলের অন্যতম বিষয়। তাছাড়া, এসব জলবায়ুর ভিত্তিতে যে সব উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীকুলের সংশ্লিষ্টতা গড়ে উঠেছে তাও জানার চেষ্টা করা হয়। জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য বিশেষত: তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আপেক্ষিক আর্দ্রতা কৃষির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে কৃষির বৈশিষ্ট্য জানা কৃষি ভূগোলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাছাড়া, জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য মানুষের আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে বিভিন্নভাবে যেমন প্রভাবিত করে, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধাও জোগায়। যেমন, মেরু অঞ্চলের এসকিমোরা সারা বছরই মৎস্য/সীল শিকারের উপর নির্ভর করে; সেখানকার ভূমি বেশিরভাগ সময় তুষার আচ্ছাদিত থাকায় কৃষির কোন সুযোগ নেই। আবার, মরু অঞ্চলের যাযাবরগণ অনুর্বর বেলে মৃত্তিকায় চাষের পরিবর্তে বিকল্প হিসাবে পশু

চারণের দিকেই বেশি মনোযোগী। মানুষের আর্থনীতিক কর্মকান্ডে জলবায়ুর এ প্রভাব অর্থনীতিক ভূগোলে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়।

প্রাকৃতিক ভূগোলের আরেকটি বিষয় পানি। পৃথিবীর পানি সম্পদের বন্টন, স্বাদু ও মিঠা পানি, এর চক্র এবং ভূগঠনের অন্যতম প্রক্রিয়া হিসাব পানির গুরুত্ব; বিশেষতঃ ক্ষয় সাধন, পরিবহন ও সঞ্চয়ন কাজে। তাই, প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্যতম উপাদান পানি। তাছাড়া, প্রাকৃতিক ভূগোলের ন্যায় মানবিক ভূগোল এর বিভিন্ন উপবিভাগে যে সব বিষয় আলোচনা করা হয় তা ও পরিবেশ থেকে বিছিন্ন নয়। যেমন- অর্থনৈতিক ভূগোল, কৃষি ভূগোল, নগর ভূগোল, বসতি ভূগোল, জনসংখ্যা ভূগোল। এ সব ভূগোলের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় মানুষকে ঘিরে, তার চারপাশের ভৌত পরিবেশের ভিত্তিতে গড়ে উঠে। যেমন, অর্থনৈতিক ভূগোল প্রাকৃতিক সম্পদের বন্টন, আহরণ এবং মানবীয় নানান ক্রিয়াকলাপ নিয়ে আলোচনা করে। আবার, নগর কিংবা বসতি ভূগোলও মানুষকে কেন্দ্র করে হলেও তা প্রকৃতির বিভিন্ন সম্ভাবনাকে মানুষ তার নিজস্ব মেধা, মনন ও শ্রম দ্বারা কাজে লাগিয়ে কিভাবে গড়ে তুলছে নগর কিংবা গ্রাম বসতি তা আলোচনা করে থাকে। এক্ষেত্রে ও ভূগোল পরিবেশ কেন্দ্রীক। এমন কি জনসংখ্যা ভূগোলে ও পরিবেশ-এর গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যার বন্টন, ঘনত্ব, কাঠামো, শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি প্রতিটি দেশের ধারণ ক্ষমতা, সম্পদের প্রাচুর্যতার আলোকে বিবেচনা করায় জনসংখ্যা ভূগোল পরোক্ষভাবে সে দেশের ভৌত পরিবেশ কতখানি চাপের মুখে (stressful) আছে তা ইঙ্গিত করে।

পানির বন্টন, চক্র,

নগর কিংবা বসতি

মানবিক ভূগোলের বিষয়সমূহ কেন পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়?

ভূগোলের এসব উপবিভাগের আলোচ্য বিষয়গুলো থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট, তা হলো, মানুষের ন্যায় পরিবেশ ভূগোলের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরিবেশ বিহীন ভূগোলের অস্তিত্ব থাকে না। পানি ভৌত পরিবেশের অংশ হিসাবে জীব জগতের অন্যতম পরিচালকের ভূমিকা পালন করে থাকে। ভূগোলের পানি বিদ্যা ও সমুদ্র বিদ্যা পানি বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে। একইভাবে জীব ভূগোলে প্রাকৃতিক পরিবেশে যেসব উদ্ভিদ আছে ও প্রাণী বসবাস করে তাদের বন্টন, আবাসস্থল ও বাস্তুতন্ত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে থাকে। তাছাড়া উদ্ভিদের ব্যবহার, সম্পদ হিসাবে এবং জলবায়ুগত ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বনভূমির গুরুত্ব সবই জীব ভূগোলের আওতায় বিবেচনা করা হয়। উদ্ভিদকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা না করে, বিভিন্ন ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশে বিশ্বব্যাপী যে সব প্রাণী বসবাস করে তাদের বাস্তুতন্ত্র, এদের বন্টন ও মানব সভ্যতার অত্যাবশ্যকীয় অংশ হিসাবে জীব ভূগোলে উদ্ভিদের সাথে প্রাণীকূলকে ও বিবেচনা করা হয়।

পানি ভৌত পরিবেশের অংশ।

প্রকৃতির অংশ হিসাবে উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ে বাস্তুতন্ত্র গড়ে তোলে। মানুষ তার আচরণ দ্বারা উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের ভৌত পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। এই সব পরিবর্তন, যেমন বিশ্বব্যাপী ব্যাপক বনভূমি পরিস্কার করে কৃষি ভূমিতে রূপান্তর করছে। ফলে, একদিকে বনভূমি মাথাপিছু যেমন হ্রাস পাচ্ছে তেমনি প্রাণীর আবাস স্থল ও সংকুচিত হচ্ছে। অতিমাত্রায় বনভূমি কমে যাওয়ায় বিশ্বব্যাপী আবহাওয়াগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। যেমন, ক্ষরা, বন্যা, ভূমিক্ষয়, ভূমি ধস ইত্যাদি। ভূগোলে প্রাকৃতিক পরিবেশের এসব পরিবর্তন গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়।

প্রাকৃতিক পরিবেশে উদ্ভিজ্জ ও প্রাণী মিলে বাস্তুতন্ত্র গড়ে তোলে।

পাঠ সংক্ষেপ

ভূগোল জ্ঞান চর্চায় পরিবেশ ও মানুষ প্রধান বিবেচ্য বিষয়। ভূগোলের দুটি মূল ধারা: প্রাকৃতিক ও মানবিক। প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রধান আলোচ্য বিষয় ভূমি, পানি ও বায়ুমন্ডল; মূলত: এই তিনটি প্রধান বিষয় নিয়েই প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত। মানবিক ভূগোল ও পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে মানুষের আর্থনীতিক কর্মকান্ড বিবেচনাই এখানে প্রাধান্য পায়। মানবিক কর্মকান্ডের কারণে বিশ্বব্যাপী ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশের যে সব পরিবর্তন সাধিত হয় ভূগোল তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১. **শূণ্যস্থান পূরণ করুন** (সময় ৩ মিনিট) ঃ

১.১ ভূগোলের প্রধান দুটি ধারা … … … ও … … …।

১.২ প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রধান তিনটি উপাদান ভূমি, পানি ও … … …।

১.৩ অতিমাত্রায় বনভূমি হ্রাস পাওয়ায় বিশ্বব্যাপী … … … বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী (সময় ৬ মিনিট) ঃ

১. ভূমিরূপ বিদ্যার প্রধান আলোচ্য বিষয় কি?

২. প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে কি বুঝায়?

৩. বাস্তুতন্ত্র কি?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. ভূগোলে পরিবেশের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

পাঠ ১.৬ : সমাজে ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা (The Relevance of Geography and Environment to the Society)

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে–

◈ সমাজে ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।

ভূগোল ও পরিবেশ জ্ঞান কেন সমাজের জন্য প্রয়োজন তা জানার জন্য প্রথমেই ভূগোল ও পরিবেশ বিষয় কি এ সম্পর্কে জানা দরকার। সরলভাবে বললে, ভূগোল হল মানুষের আবাসস্থল হিসাবে পৃথিবী বিষয়ক সমীক্ষা (Study of the Earth as the home of man)। মানুষের এ আবাসস্থল ভূগোলকের সারা বহিরাবরণ জুড়েই বিস্তৃত। এখানেই মানুষের শুরু এবং শেষ এবং আবাসস্থলের প্রায় সর্বত্রই তার উপস্থিতি আছে। মানুষ এ পৃথিবীর আলো, মাটি, পানি বায়ুকে নির্ভর করেই তার সমস্ত ক্রিয়াকলাপ এগিয়ে নিয়ে যায়।

মানুষের আবাসস্থল হিসাবে পৃথিবী বিষয়ক সমীক্ষাই ভূগোল।

মানুষের যাবতীয় বস্তুগত প্রয়োজনীয় সম্পদ পৃথিবীই তাকে যোগায়। এমনকি পৃথিবীর অনাবিল সৌন্দর্য্য যেমন তার চোখ জুড়িয়ে দেয় আবার কুৎসিত বিষয়াদিও তার দৃষ্টি এড়ায় না। তাই যখন কেউ পৃথিবীর পরিবেশ নিয়ে কথা বলে সে নিশ্চয়ই মানুষের সাথে সম্পর্কবিহীন পরিবেশের কথা বলে না। মানুষ ও পৃথিবীর পরিবেশ অবিচ্ছেদ্য। মানুষ ও পরিবেশের এ অবিচ্ছেদ্যতাকে দুই ভাবে দেখা যায়ঃ

ক. কিভাবে পরিবেশ মানুষের ক্ষমতাকে সীমিত করে, কিভাবে তা কোন কাজে বাঁধা হয় না, আবার অন্যত্র বাঁধার কারণ হয়; কিভবে তা বিকল্প ব্যবস্থাকে সহজ করে তোলে, আবার কোন ক্ষেত্রে বিপত্তি ঘটায়; এবং

খ. মানুষ পরিবেশকে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে, ভাল-মন্দ উভয় ধরনের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে সে কিভাবে পৃথিবীর পরিবর্তন আনছে।

‘কিভাবে' অনেক শাখায়ই পরিবেশের আলোকে মানুষের ক্রিয়াকলাপ আলোচিত হয়। তাহলে, ভূগোল ও পরিবেশের বিশেষ প্রয়োজন কেন? নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো-

১. বিবিধের মধ্যে ঐক্য

ভূগোল ও পরিবেশের অস্তিত্ত্ব আছে কারণ মানুষ ভূপৃষ্ঠস্থ বৈচিত্র সম্পর্কে অবগত হতে চায় এবং এর স্থানিক তারতম্য জানতে আগ্রহী। পৃথিবীর স্থান ও অঞ্চলসমূহে যেমন বৈচিত্র আছে আবার কোন বিশেষ প্রকৃতির বিচারে বেশ কিছু স্থান বা অঞ্চলের সামঞ্জস্যতাও আছে। কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের আলোকে পৃথিবীর এই সব সমধর্মী সামঞ্জস্যপূর্ণ স্থান এবং এলাকাসমূহকে চিহ্নিত করা ও পৃথকধর্মী এলাকাসমূহকে আলাদা করাই স্থানিক পার্থক্যকরণ (Areal differentiation)। একমাত্র ভূগোলে পৃথিবীর এ স্থানিক বৈচিত্রতার মধ্যেই সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্য অনুসন্ধান করে থাকে।

ভূগোলে আর একটি বিবেচ্য বিষয় হলো মানুষের অর্থনীতিক বৈচিত্রময় কার্যকলাপের পিছনে যে নিয়ামক কার্যকর তা ব্যাখ্যা করা এবং এর কার্যকারণ সম্পর্কে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক নিয়ামক সমূহের যোগসূত্র নির্ণয় করা।

বিবিধের মধ্যে ঐক্য এর অর্ন্তনিহিত বক্তব্য কি?

২. পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান

সংখ্যাতাত্ত্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ।

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যেখানে বসবাস করে তার চেয়ে বৃহত্তর পরিমন্ডল নিয়ে তার ক্রিয়াকলাপের ব্যাপ্তি এবং স্বভাবত:ই নাগরিক হিসাবে তার দেশের প্রতি দায়িত্ব আছে। প্রতিটি দেশই বিশ্ব পরিবেশের অংশ হওয়ায় ভূগোলবিদদের আঞ্চলিক ভূগোলে মানুষ পরিবেশ জ্ঞান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সম্পদ আহরণে ও ব্যবহারে প্রযুক্তি ব্যবহারের তারতম্য এবং এর ফলশ্রুতিতে দেশ ও অঞ্চলগত জীবন-যাত্রার মানের যে বৈষম্য তা জানা প্রয়োজন। ভূগোল ও পরিবেশ জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলসমূহের সংখ্যাতাত্ত্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করা সম্ভব।

ভূগোল ও পরিবেশ জ্ঞান দ্বারা এর পাঠকদের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা যায়। বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি নাগরিকই তার চারপাশের প্রাকৃতিক আর্থ-সামাজিক পরিবেশের সাথে নিয়তই খাপ খাইয়ে চলছে। তাই প্রাকৃতিক আর্থ-সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে সঠিক তথ্য আহরণ কৌশল অবগত হওয়া জরুরী। ভৌগোলিক জ্ঞানের মাধ্যমে এ কৌশল অর্জন সম্ভব।

৩. মানস মানচিত্র

তাৎক্ষণিকভাবে তার অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক আবস্থাকে মানস মানচিত্রের

ভৌগোলিক জ্ঞান এর চর্চাকারীকে কোন এলাকা বা অঞ্চল সম্পর্কে একটি 'মানস মানচিত্র' (Mental map) কল্পনা করে নিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে; বিশেষ করে এর প্রাকৃতিক অবস্থান, বৈশিষ্ট্যাবলী, রাস্তাঘাট, নগর, কলকারখানা ইত্যাদি। এ ধরনের 'মানস মানচিত্রের' মাধ্যমে সে যখন জাতীয় বা বিশ্বের কোন বা এলাকা সংবাদ/ঘটনা জানে তাৎক্ষণিকভাবে তার অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে 'মানস চিত্রের' সাথে মিলিয়ে নিতে পারে; ফলে তা অনেক বেশী তাৎপর্যবহ হয়ে উঠে।

৪. কারণ অনুসন্ধান

ফলে সময়ের প্রেক্ষিতে ধরন, ব্যাপ্তি, গুরুত্ব ও বিবর্তন সম্পর্কে সঠিক ধারনা পাওয়া সহজ হয়।

ভূগোলের চর্চাকারীগণ কোন একটি এলাকা বা অঞ্চলের প্রাকৃতিক বা সাংস্কৃতিক কোন বৈশিষ্ট্য কেন সে অবস্থানে তার কারণ অনুসন্ধান করে থাকে। যেমন, নদী অববাহিকায় কেন প্রায় প্রতি বছর বন্যা হয়? প্রতি বছর বন্যা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে জেনেও কেন নদী তীরে লোক বসতি গড়ে উঠে? এ সব প্লাবন ভূমির বসবাসকারীগণ কিভাবে বন্যা মোকাবেলা করে থাকে? ভৌগোলিক জ্ঞান দ্বারা কোন বিশেষ শিল্প বা নগর কেন তার বর্তমান অবস্থানে গড়ে উঠেছে তার ভৌত ও আর্থ-সামাজিক নিয়ামকসমূহের আলোকে এর অবস্থানগত ব্যাখ্যা খুঁজে। ফলে সময়ের প্রেক্ষিতে ধরন, ব্যাপ্তি, গুরুত্ব ও বিবর্তন সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া সহজ হয়।

৫. সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

সমন্বিত ধারণা।

ভূগোল এর চর্চাকারীগণ কোন একটি স্থান বা অঞ্চল সম্পর্কে সহজেই একটি সমন্বিত ধারণা দিতে পারেন যা ঐ এলাকায় সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যাবলীকে চিত্রায়িত করে থাকে। যেমন, দক্ষিণ এশিয়ার 'মৌসুমী' ও 'ঘনবসতিপূর্ণ' অঞ্চল শব্দের মাধ্যমে এ অঞ্চলের সাথে ঘনবসতির যোগসূত্র অনুসন্ধানের মাধ্যমে এ অঞ্চলের একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা যায়।

৬. মানচিত্র পঠন

অবস্থান ও ব্যাপ্তি, স্থানিক সংবদ্ধতা।

ভূগোল চর্চায় মানচিত্র একটি অন্যতম হাতিয়ার। মানচিত্রের মাধ্যমে বিষয়াদির (যেমন, আবহাওয়া, কৃষি, বন্যা বা খরা কবলিত এলাকা) অবস্থান ও ব্যাপ্তি যেমন তুলে ধরা যায় তেমনি এর মাধ্যমে কোন স্থানের বিভিন্ন সংগঠনসূহ কিভাবে স্থানিকভাবে সংঘবদ্ধতাও মানচিত্রের মাধ্যমে দেখানো

যায়। ভূগোল চর্চার মাধ্যমে এর চর্চাকারীদের কার্যকরভাবে মানচিত্র ব্যবহার শেখানো হয় যা আর কোন বিষয়ে তেমন গুরুত্ব পায় না।

৭. পর্যবেক্ষণ

ভূগোল ও পরিবেশ জ্ঞান আমাদের সারা জীবনের জন্য একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। ভূগোল জ্ঞান আহরিত হয় মাঠে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। মাঠ থেকে সংগ্রহীত সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে কোন বিষয়ে বা ঘটনার সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। তাই ভূগোল চর্চায় পর্যবেক্ষণকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

মাঠে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ-এর মাধ্যমে ভূগোল জ্ঞান আহরিত হয়।

পাঠ সংক্ষেপ

সমাজে ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। ভূগোল জ্ঞান পৃথিবীর স্থানিক বৈচিত্রতার মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্য অনুসন্ধান করে থাকে। ভৌগোলিক জ্ঞানের মাধ্যমে পৃথিবীতে দেশ ও অঞ্চলভিত্তিক মানুষের জীবন যাত্রা ও কর্মকান্ডের তারতম্য সম্পর্কে জানা যায়। তাছাড়া, ভৌগোলিক জ্ঞানের চর্চাকারীকে কোন এলাকা বা অঞ্চল সম্পর্কে একটি মানস মানচিত্র কল্পনা করে নিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে। ভূগোলে কোন এলাকার বিশেষ প্রাকৃতিক বা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলীর অবস্থানগত কারণ অনুসন্ধানে সচেষ্ট হয় এবং কোন স্থান বা অঞ্চল সম্পর্কিত একটি সমন্বিত ধারণা দিতে সক্ষম হয়। মানচিত্র ব্যবহার ও মাঠ থেকে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করা ভূগোল চর্চায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১. **শূন্যস্থান পূরণ করুন** (সময় ৩ মিনিট) ঃ

১.১. মানুষ এ পৃথিবীর আলো, মাটি, ------, বায়ুকে নির্ভর করেই তার সমস্ত ক্রিয়াকলাপ এগিয়ে নিয়ে যায়।

১.২ নদী অববাহিকায় প্রায় -------- বছর বন্যা হয়।

১.৩. -------- চর্চায় মানচিত্র একটি অন্যতম হাতিয়ার।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী (সময় ৮ মিনিট) ঃ

১. স্থানিক পার্থক্যকরণ বলতে কি বুঝায়?

২. মানস মানচিত্র কি?

৩. ভূগোল চর্চাকারীগণ কোন স্থান বা এলাকা অনুসন্ধানে কিসের ওপর গুরুত্ব দেন?

৪. মানচিত্র পঠন ও মাঠ পর্যবেক্ষণ ভূগোলে কেন গুরুত্বপূর্ণ?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. ভূগোলে পরিবেশ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিস্তারিত আলোচনা করুন।